একক ৪ক ❑ ভারতে বিদেশী শক্তির উন্মেষ—কুষাণ, গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের ইতিহাস। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের উদ্ভব।

গঠন

৪ক.০ উদ্দেশ্য

৪ক.১ প্রস্তাবনা

৪ক.২ ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ

- ৪ক.২.১ ইউথিডিমস
- ৪ক.২.২ ডেমিট্রায়স
- ৪ক.২.২ ইউক্রটিডিস
- ৪ক.২.২ হেলিওক্লেস
- ৪ক.২.২ মিনান্দার
- ৪ক.২.২ মিনান্দারের পরে
- ৪ক.২.২ হারমাইয়স

৪ক.৩. শক-পার্থিয়গণ

- ৪ক.৩.১ তক্ষশিলার শক-সম্রাটগণ
- ৪ক.৩.২ মধুরার ক্ষত্রপগণ
- ৪ক.৩.৩ সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ
- ৪ক.৩.৪ পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণ

৪ক.৪ কুষাণ সাম্রাজ্য

- ৪ক.৪.১ কুজুল কদফিস
- ৪ক.৪.২ বিম কদফিস
- ৪ক.৪.৩ প্রথম কনিষ্ক
- ৪ক.৪.৪ কনিষ্কের শাসনব্যবস্থা
- ৪ক.৪.৫ কনিষ্কের উত্তরাধিকারীগণ
- ৪ক.৪.৬ কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতি

৪ক.৫ সাতবাহনগণ
৪ক.৫.১ কালসীমা
৪ক.৫.২ সিমুক
৪ক.৫.৩ কৃষ্ণ
৪ক.৫.৪ প্রথম সাতকর্ণি
৪ক.৫.৫ দ্বিতীয় সাতকর্ণি
৪ক.৫.৬ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি
৪ক.৫.৭ পুলুমায়ী
৪ক.৫.৮ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি
৪ক.৫.৯ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা
৪ক.৫.১০ সমাজ ও ধর্ম
৪ক.৬ অনুশীলনী
৪ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪ক.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন : মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে কীভাবে একের পর এক বিদেশী শক্তিসমূহের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিশেষভাবে আলোচিত হবে কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস এবং কণিষ্কের রাজত্বকাল এবং কুষাণদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবদান।

দক্ষিণ-ভারতের মৌর্য পরবর্তী যুগের প্রধান শক্তি সাতবাহনবংশের ইতিহাস। সাতবাহনদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির রাজত্বকাল ও অবদান এবং সাতবাহনদের রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিবৃত্তর এই এককের সার সংকলন।

৪ক.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আলোচিত হবে মৌর্য-পরবর্তী যুগের ভারতের অবস্থা। মৌর্য সাম্রাজ্যে নানাভাবে ভারতের ঐক্য অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের সেই ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। এর সুযোগ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে একের পর এক বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। সেলুকাস প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্যাকট্রিয়া নামক প্রদেশটির থেকে আগত ব্যাকট্রিয় গ্রীকরা মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথম উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশ আক্রমণ ও অধিকার করে। সেলুকিড সম্রাটগণ

প্রধানত সিরিয়ার শাসকরূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইউথিডিমসের সময় ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল এবং তাঁর পুত্র ডেমিট্রায়সের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকদের সম্প্রসারণ নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছিল। ইন্দো-গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দার ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তিনিই ছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্হোর মিলিন্দ। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক মিনান্দার নিজেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মুদ্রার অধিকাংশই রূপোর অথবা তামার যা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর সাম্রাজ্য যেমন সুবিস্তৃত ছিল, তেমনই তৎকালীন বাণিজ্যের প্রসারও ঘটেছিল।

গ্রীকদের পরে আক্রমণকারীরূপে এসেছিলেন শক ও পার্থিয়গণ। ভারতে শকদের ইতিহাস কেন্দ্রস্থ ছিল তক্ষশিলা, মথুরা, সুরাষ্ট্র এবং মালবে।

পার্থিয়দের পরে এসেছিলেন কুষাণগণ। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থিয়দের বিতাড়িত করে, উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠত করেন। কুষাণগণ যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত এবং অন্যদিকে চীন সাম্রাজ্যের প্রান্ত স্পর্শ করেছিল। কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রথম কনিষ্ক শুধু রাজ্য বিজেতা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেন নি, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সঙ্গীতির চতুর্থ অধিবেশনে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়। কুষাণগণ শিল্প ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুষাণদের অনুপ্রেরণায় অসংখ্য চৈত্য, মন্দির, নগর, স্তূপ ও বিহার নির্মিত হয়েছিল এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার শিল্পরীতি এক স্বতন্ত্র মহিমায় বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ও উৎকর্ষেরও সূচনা হয়েছিল এই যুগেই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় *বুদ্ধচরিত* প্রণেতা অশ্বঘোষের নাম অথবা প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নাগার্জুনের।

মৌর্য-পরবর্তী এবং গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস প্রধানত সাতবাহন বংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। তাই এই এককের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন যে দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রকে নিয়ে কীভাবে সাতকাহন বংশ একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি নিঃসন্দেহে ছিলেন গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি। গৌতমীপুত্রের মাতা গৌতমী বলশ্রী রচিত নাসিক প্রশস্তি থেকে গৌতমীপুত্রের রাজ্যজয়ের উপাখ্যান যেমন জানা যায়, তেমনিই এর থেকে আরো জানা যায় যে গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহন বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শকদের পরাজিত করে তিনি পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অংশবিশেষ বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। গৌতমীপুত্র ও তাঁর পরবর্তী সাতবাহন নৃপতি বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির নেতৃত্বে বৃহৎ সাতবাহন সাম্রাজ্যের একটি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থারও পত্তন হয়েছিল।

৪ক.২ ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ

মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধুনদ এমনকি হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে এই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। সেলুকাসের সঙ্গে সন্ধিতে তিনি সিন্ধু উপত্যকার কয়েকটি অঞ্চল লাভ করেছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে মৌর্য অধিকার ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। মৌর্য সাম্রাজ্যের এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রীকরা আবার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-ভারতের বৃহৎ অংশ আক্রমণ ও অধিকার করে। এই গ্রীক আক্রমণকারীরা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে আসেনি। তারা পূর্বাঞ্চলে সেলুকিড (সেলুকাস প্রতিষ্ঠিত) সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ, ব্যাকট্রিয়া থেকে এসেছিল। তাই ইতিহাসে তারা ব্যাকট্রিয় গ্রীক নামে পরিচিত।

এই সেলুকিড সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্বভাগ নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর যখন তাঁর সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল, তখন সেলুকাস এই অঞ্চল লাভ করেছিলেন। সিরিয়া (ব্যাকট্রিয়া এবং পার্থিয়া) সেলুকিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিরিয়া ছিল সেলুকিড সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। সেলুকিড সম্রাটগণ তাই প্রধানত সিরিয়ার শাসকরূপে পরিচিত।

খ্রিস্টপূর্ব ২৯৩ অব্দে সেলুকাস তাঁর পুত্র এ্যান্টিওকাসকে যুগ্ম রাজারূপে গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে এই এ্যান্টিওকাস স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি প্রথম এ্যান্টিওকাস নামে পরিচিত। সিরিয়ার পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাসের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬১-২৪৬ অব্দ) ব্যাকট্রিয়া এবং পার্থিয়া উভয়েই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্যাকট্রিয়ায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গ্রীক শাসনকর্তা ডায়োডেটাস। পার্থিয়ার বিদ্রোহ ঘটান আরসাকেস। তাঁর আদি পরিচয় জানা যায় না। দুটি বিদ্রোহের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। আরসাকেসের বিদ্রোহের পিছনে জসমর্থন ছিল। ডায়োডোটাসের পিছনে তা ছিল না। তাঁর বিদ্রোহের পিছনে একান্তভাবে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল।

দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস এবং তাঁর পরবর্তী দুইজন সিরিয়ার শাসক, দ্বিতীয় সেলুকাস (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৬-২২৬ অব্দ) এবং তৃতীয় সেলুকাস (খ্রিস্টপূর্ব ২২৬-২২৩ অব্দ) এই বিদ্রোহ দমন করতে পারেন নি। পরবর্তী শাসক, তৃতীয় এ্যান্টিওকাস, যিনি এন্টিওকাস দ্য গ্রেট নামে পরিচিত, এই প্রদেশ দুইটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন, তাতে এই প্রদেশ দুইটির স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়। তখন ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন ইউথিডিমস।

ডায়োডোটাস দীর্ঘকাল ব্যাকট্রিয়া শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সিরিয়ার সম্রাটের অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরে, স্বাধীন নৃপতি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি প্রথম ডায়োডোটাস নামে পরিচিত। জাস্টিন লিখেছেন, পার্থিয়ার আরসাকেসের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি আরও লিখেছেন যে, অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ডায়োডোটাস সিংহাসনে বসেন। তিনি বৈদেশিক ক্ষেত্রে পিতার নীতির পরিবর্তন করেন। পার্থিয়ার প্রথম রাজা আরসাকেসের সঙ্গে তিনি মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন করেন। তাঁর এই নীতি বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। দ্বিতীয় সেলুকাসের দুরভিসন্ধির হাতে থেকে এই নীতি ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়াকে রক্ষা করেছিল।

দ্বিতীয় ডায়োডেটাস ঠিক কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, বলা কঠিন। পলিবায়াস লিখেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে যখন তৃতীয় এ্যান্টিওকাস হৃত প্রদেশ দুইটি পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আসেন, তখন তিনি ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসনে ইউথিডিমসকে দেখেন। এই ইউথিডিমস ছিলেন ম্যাগনেসিয়ার অধিবাসী। তিনি দ্বিতীয় ডায়োডোটাসকে সিংহাসনচ্যুত এবং হয়তো হত্যা করেন।

৪ক.২.১ ইউথিডিমস

ইউথিডিমসের সময় ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ব্যাকট্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ডায়োডোটাস। এই ইউথিডিমস এবং তাঁর পুত্র ডোনট্রায়সের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকদের সম্প্রসারণ নতুন ভাবে আরম্ভ হয়। ইউথিডিমস অবশ্য তৃতীয় এ্যান্টিওকাসের বিরুদ্ধে সামরিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায়নি। তাঁর রাজধানী ব্যাকট্রা অবরুদ্ধ এবং তাঁর নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু কূটনীতিতে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে দূত হিসাবে এ্যান্টিওকাসের কাছে পাঠান এবং শান্তির প্রস্তাব করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে এ্যান্টিওকাস ইউথিডিমসের সঙ্গে সন্ধি করেন, তাছাড়া তিনি তাঁর একটি কন্যার সঙ্গে ডেমিট্রায়সের বিবাহ দিতে সম্মত হন। এর পর তিনি ব্যাকট্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন, কাবুল নদীর উপত্যকা দিয়ে সুভগসেনের রাজ্যে আসেন। এই সুভগসেন হয়তো মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং মৌর্যদের পতনের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তৃতীয় এ্যান্টিওকাস তাঁর বশ্যতা আদায় করে স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর এ প্রত্যাবর্তনের পর গ্রীকদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা রূপায়ণের আর কোন বাধা থাকে না।

ইউথিডিমসের মুদ্রার প্রাচুর্য থেকে মনে হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করেন। তবে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা প্রসারিত করেছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০ অব্দে তিনি মারা যায় ইউথিডিমস ব্যাকট্রিয়াকে দৃঢ় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শক্তির সাহায্যেই ডেমিট্রায়স গ্রীক বাহিনীকে ভারতের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তাঁর এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। তবুও তিনিই ভারতের মাটিতে গ্রীক আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

৪ক২.২ ডেমিট্রায়স

ডেমিট্রায়স সম্পর্কে আমরা সাহিত্য এবং মুদ্রা থেকে জানতে পারি। সম্ভবত ৩৫ বৎসর বয়সে ডেমিট্রায়স ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রথম থেকেই রাজ্যজয় নীতি গ্রহণ করেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তাঁর পিতা ইউথিডিমস সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক শূন্যতা তাঁর উচ্চাশা পূরণের সহায়ক হয়েছিল। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং মিত্র এবং অধীন অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়ে সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর অংশবিশেষ জয় করেন। টলেমি বলেছেন যে, সাকল (শিয়ালকোট) তাঁর বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 'দত্তমিত্র' এবং সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকায় ডেমিট্রায়সপলিস অভিন্ন ছিল। তাঁর মুদ্রার হস্তিমূর্তি থেকে মনে হয় যে, কপিশ (কাফিরিস্তান) তিনি জয় করেছিলেন। আলেকজান্ডারের মতো তিনি তাঁর পশ্চাৎ অংশ রক্ষা ও শাসন করার জন্য কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্ট্রাবো পাটলিপুত্র পর্যন্ত যবন অগ্রগতির কথা বলেছেন, কিন্তু ডেমিট্রায়সের নামোল্লেখ করেননি। পতঞ্জলি সাকেত এবং মাধ্যমিকে যবন আক্রমণের এবং পাটলিপুত্রে আতঙ্ক সৃষ্টির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিও ডেমিট্রায়সের নামোচ্চারণ করেন নি।

ডেমিট্রায়সের রাজ্যজয় সম্পর্কে টার্ন বলেছেন যে, পরিকল্পনা, পদ্ধতি, অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বিজিত অঞ্চলের দিক থেকে ডেমিট্রায়স প্রথম দারয়বৌষ এবং আলেকজান্ডারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে 'অপরাজেয়'

উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোন রাজা তা করেননি। তিনি দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হতে চেয়েছিলেন। আলেকজান্ডার যেমন খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে পারস্য জয় না করে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র জয় করেন, ডেমিট্রায়সও তেমনি মৌর্য সাম্রাজ্য জয় না করে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনী) দখল করেছিলেন। এর অনিবার্য পরিণতি কী হবে, তিনি জানতেন।

ডঃ নারায়ণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, ডেমিট্রায়সের ভারতে বিস্তৃত জয়ের কাহিনী খুব ক্ষীণ সূত্রের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতির সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শক এবং পার্থিয়গণের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল।

অল্পকাল মধ্যে ব্যাকট্রিয়ার উপর ডেমিট্রায়সের অধিকার বিপন্ন হয়েছিল। এই সংকট সৃষ্টি করেছিলেন ইউক্রাটিডিস। তিনি ব্যাকট্রিয়া ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জাস্টিন লিখেছেন যে, তিনি ব্যাকট্রিয়ার বিদ্রোহ ঘটান এবং নিজে ব্যাকট্রিয়ার রাজা হন।

৪ক.২.৩ ইউক্রাটিডিস

ইউক্রাটিডিসের পূর্বজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ডেমিট্রায়সের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাকট্রিয়ার যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন, তাতে সমসাময়িক সম্রাট সেলুকিড ইন্ধন জুগিয়ে ছিলেন। এই বিদ্রোহের ফলে, আনুমানিক সম্রাট ১৭১ অব্দে তিনি ব্যাকট্রিয়ার রাজা হন। এর ফলে তিনি কপিশ, এমনকি পুষ্করাবতী এবং তক্ষশিলা জয় করেন।

৪ক.২.৪ হেলিওক্লেস

ইউক্রাটিডিসির পরে হেলিওক্লেস রাজা হন। জাস্টিন ভিন্ন অন্য কারও রচনায় তাঁর কথা পাওয়া যায় না। তাঁর রকমারি মুদ্রা থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর রৌপ্য মুদ্রা বর্জন করেছিলেন, তা বোঝা যায় যে, তিনি ব্যাকট্রিয়া পরিত্যাগ করে শুধু ভারতীয় অঞ্চলই শাসন করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনিই শেষ গ্রীক শাসক, যিনি অন্তত কিছুকাল ব্যাকট্রিয়া এবং ভারত, দুই-ই শাসন করেছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, শকগণ তাঁকে ব্যাকট্রিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। (এই শকরা ইউচিগণ কর্তৃক তাদের বাসস্থান সগডিয়ানা (বোখারা) থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন)। শকদের মুদ্রায় হেলিওক্লেসের মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। হেলিওক্লেসের তাম্র মুদ্রায় হাতি এবং ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে। তা থেকে তিনি কোন্ অঞ্চল শাসন করতেন, অনুমান করা যায়। হাতি থেকে মনে হয়, কপিশ অঞ্চল ও ষাঁড় থেকে গান্ধার অঞ্চল। তিনি যে মুদ্রাগুলির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন তা থেকে ইউথিডিমসের এবং ইউক্রাটিডিসের বংশের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়। চৈনিক উপাদান থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৪ অব্দের মধ্যে শকগণ ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে।

৪ক.২.৫ মিনান্দর

ইন্দো-গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দার বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। স্ট্রাবো, প্লুটার্ক, জাস্টিন সকলেই তাঁর কথা লিখেছেন। ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ *মিলিন্দ পঞহো*-র মিলিন্দ এবং তিনি অভিন্ন, একথা ইতিহাসের উপাদান

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাঁর স্মৃতি সময়ের সীমা লঙ্ঘন করেছিল। খ্রিষ্ট্রীয় একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র রচিত অবদান কল্পলতায় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে।

মিলিন্দ পঞ্হো অনুসারে আলাসান্দা দ্বীপের অন্তর্গত কালাসাইয়ে মিনান্দারের জন্ম হয়। এই স্থানটি সাকল (শিয়ালকোট) থেকে ২০০ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। কালাসাই ঠিক কোথায় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে আলাসান্দা যে ভারতীয় ফকেসাসের দক্ষিণে আলেকজান্ডার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। এই পালি গ্রন্থ অনুসারে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৫০০ বছর পরে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু এই বিবরণে মুদ্রার সমর্থন পাওয়া যায় না। মুদ্রা থেকে মনে হয় তিনি আরও আগের মানুষ ছিলেন। সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ডঃ সরকার তাঁকে আরও কিছুকাল পরে স্থাপন করতে চান। তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব ১১৫-৯০ অব্দে তিনি রাজত্ব করেন।

মিনান্দারের রাজধানী ছিল সাকল বা শিয়ালকোট। হোয়াইটহেড মনে করেন যে, পাহাড় অঞ্চলে তাঁর অপর একটি গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। তাঁর সময়ে ইন্দোগ্রীক শক্তি সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা থেকে পূর্বে রাবি নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে সোয়াট উপত্যকা থেকে দক্ষিণে আরাকোসিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যে অনেক উপ-রাজা ছিলেন। টার্ন বলেছেন, বিভিন্ন সামন্ত রাজ্য এবং স্বাধীন জনগণকে নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের সদিচ্ছার উপর এই সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল অল্পসংখ্যক গ্রীক শাসিত একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য। কাবুল থেকে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। পেরিপ্লাস-এর লেখক বলেছেন যে, তাঁর সময়ে এ্যাপোলোডোটাসের মুদ্রার সঙ্গে মিনান্দারের মুদ্রাও বারিগাজায় প্রচলিত ছিল। অধীন এবং অনুগত নৃপতিদের সাহায্যে মিনান্দার সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, বিপাশা পরবর্তী অঞ্চলও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এই লেখতে তারও আভাস পাওয়া যায়।

মিনান্দার শুধু বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। *মিলিন্দ পঞ্হোতে* এমন কথা বলা হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি মুদ্রায় "মহারাজস" (মহারাজের) "ত্রতরস" (ত্রাতার) "মেনাদ্রস" (মিনান্দারের), এই কথাগুলি আছে। কিন্তু কতকগুলি মুদ্রায় ত্রতরস শব্দের পরিবর্তে 'ধার্মিকস (ধার্মিকের) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই রৌপ্য মুদ্রাগুলিতে রাজার যে আবক্ষ মূর্তি আছে, তা একজন বয়স্ক ব্যক্তির। তাই অনেকে মনে করেন যে মেনন্দার বেশি বয়সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই মুদ্রাগুলি *মিলিন্দ পঞ্হো*-র পরিপূরক। তাঁর মুদ্রায় আটটি পাখি বা অর যুক্ত চক্রকে অনেকে বৌদ্ধচক্র মনে করেন।

মিনান্দার ভিন্ন অন্য কোন ইন্দোগ্রীক শাসকের এত বেশি বিচিত্র রকমের (ত্রিশ রকমেরও বেশি) মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তাঁর মুদ্রার অধিকাংশই রূপোর অথবা তামার। বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী তাঁর এই মুদ্রাগুলি একদিকে যেমন তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত দেয়, তেমনই অন্যদিকে তৎকালীন প্রসারিত বাণিজ্যের পরিচয় বহন করে।

৪ক.২.৬ মিনান্দারের পরে

মিনান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র প্রথম স্ট্রাটোর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর মা এ্যাগাথোক্লিয়া শাসন পরিচালনা করেন। তাঁদের দুজনের যুক্তভাবে প্রচারিত মুদ্রায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে প্রথম স্ট্রাটো কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর একক মুদ্রাও অনেক পাওয়া গেছে। আরও পরে তিনি তাঁর পৌত্র দ্বিতীয়

স্ট্রাটোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজত্ব চালান এবং তাঁদের যৌথ মুদ্রার প্রচলন করেন। এই তথ্যসমূহ থেকে মনে হয় যে প্রথম স্ট্রাটো দীর্ঘকাল, হয়তো অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল রাজত্ব করেন। এই সময় মিনান্দারের বংশধরেরা অবশ্যই দুর্দিনের সম্মুখীন হন। তাঁদের মুদ্রার নিম্নমান থেকে এই সত্য বিশেষভাবে স্পষ্ট।

৪ক.২.৭ হারমাইয়স

কাবুল উপত্যকায় হারমাইয়স শেষ ইন্দো-গ্রীক শাসক। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি রাজত্ব করেন। তিনি যখন রাজা হন তখন চারিদিকে বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে আক্রমণকারীরূপে শকরা উপস্থিত হয়েছিল। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে নতুন শত্রু পার্থিয়দের এবং উত্তরে ইউচিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইন্দো-গ্রীকদের দুই শাখার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। হারমাইয়সের কতকগুলি মুদ্রায় তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্নী ক্যালিওপির চিত্র পাওয়া গেছে। এই ক্যালিওপির সম্ভবত ইউথিডিমস শাখার রমণী ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তের এই ঐক্য ফলপ্রসূ হয়নি। তা হারমাইয়সের পতনকে প্রতিহত করতে পারেনি।

পার্থিয়গণ হারমাইয়সের পতন ঘটালেও ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের পতনের পিছনে গভীরতর কারণ ছিল। সেই কারণের কথা জাস্টিন উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''ব্যাকট্রিয়গণ বিভিন্ন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে শেষে শুধু তাদের অধিকৃত অঞ্চলই হারায় নি, তাদের স্বাধীনতাও হারিয়েছিল। সগডিয়ানগণ, ড্রাঙ্গিয়ানগণ এবং ভারতীয়গণের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, তারা যেন, ক্লান্ত অবস্থায়, দুর্বলতর পার্থিয়গণ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল''। এখন যে অঞ্চলকে সমরকন্দ এবং বোখারা বলা হয়, সগডিয়ানগণ সেই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে জাস্টিন 'সগডিয়ানগণ' বলতে শুধু এই অধিবাসীদের বোঝান নি, অন্যান্য উপজাতি (পাসিয়ানি, তোচারি, সাকারাউলি ইত্যাদি) এবং শকদের বুঝিয়েছেন, কেননা স্ট্রাবোর বর্ণনা অনুসারে এরা গ্রীকদের ব্যাকট্রিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল। ড্রাঙ্গিয়াগণ হেরাত, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের ভারতীয় শত্রুরূপে শুঙ্গ বংশের উল্লেখ করা যায়।

৪ক.৩ শক-পার্থিয়গণ

হেরোডেটাস এবং স্ট্রাবো লিখেছেন যে, মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের নাম ছিল স্কাইথিয়। এই স্কাইথিয়গণের একটি নির্দিষ্ট শাখার নাম ছিল শক। এই শকরাই ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, মধ্য এশিয়া থেকে আগত যাযাবর জাতি ইউচি এবং শকদের আক্রমণে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক আধিপত্য বিনষ্ট হয়েছিল। এই শকরা ব্যাকট্রিয়া সীমান্ত থেকে ইউচিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে গ্রীকদের অনুসরণ করে ভারতে প্রবেশ এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৪ক.৩.১ তক্ষশিলার শক-সম্রাটগণ

ভারতে শকদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল তক্ষশিলা, মথুরা, সুরাষ্ট্র এবং মালব তক্ষশিলায় শক-সম্রাটগণ এবং মথুরায় শক রাজারা শাসন করতেন। সুরাষ্ট্র এবং মালব শক-ক্ষত্রপগণের শাসনাধীন ছিল।

মার্শাল বলেছেন যে, তক্ষশিলার স্তরবিন্যাস থেকে জানা যায় যে তক্ষশিলার প্রথম শক রাজা ছিলেন মাওয়েস

বা মোগ। তিনি খুব সম্ভবত ইস্‌সককোল হ্রদ অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিংহাসনে বসেন। তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তক্ষশিলা তাম্রশাসনে লিয়াক কুসুলক নামে তাঁর অধীন এক ক্ষত্রপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে তক্ষশিলার মাওয়েসের পরবর্তী রাজা ছিলেন অজ (Azes)। অজ নামে দুজন রাজা ছিলেন : প্রথম ও দ্বিতীয় অজ। তাঁদের মধ্যস্থলে ছিলেন আজিলিসেস। কোন কোন মুদ্রায় অজ'র নাম গ্রীক অক্ষরে এবং আজিলিসেসের নাম খরোষ্ঠীতে পাওয়া গেছে। আবার কোন কোন মুদ্রায় এর বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, অজ'র পরে রাজা হয়েছিলেন আজিলিসেস এবং তার পরে দ্বিতীয় অজ। মনে হয় আজিলিসেস খুবই অল্প দিন রাজত্ব করেছিলেন। কেননা সিরকাপ নাম স্থানে (তক্ষশিলার শহর এলাকায়) প্রাপ্ত তাঁর মুদ্রার সংখ্যা নগণ্য, কিন্তু অজ'র মুদ্রার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

দ্বিতীয় অজ তাঁর মুদ্রায় মিনান্দারের মতো এথিনা মূর্তি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এ থেকে টার্ন মনে করেন যে দ্বিতীয় অজ মিনান্দারের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পূর্ব পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব তো মিনান্দারের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল না, কাবুল উপত্যকা ছিল। সুতরাং এই প্রতীকের যদি কোন তাৎপর্য থাকে তাহলে মনে করতে হয় যে দ্বিতীয় অজ কাবুল উপত্যকা জয় করেছিলেন। কিন্তু ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে তা অসম্ভব, কেননা কাবুল কখনও শকদের অধীন ছিল না।

মার্শাল মনে করেন যে বিক্রম সম্ভবৎ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ অব্দে যার সূচনা) কোনভাবে প্রথম অজ'র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। র‍্যাপসন প্রথম অজকে বিক্রম অব্দের প্রবর্তক মনে করেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রথম অজ'র রাজত্বকালে যে গণনা আরম্ভ হয়, তাই পরবর্তীকালে বিক্রম সম্ভবৎ বলে পরিচিত হয়েছিল।

এই শাসকদের সময় শক সাম্রাজ্য কয়েকটি 'সট্রাপি' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই প্রদেশসমূহে যে কেন্দ্রগুলির কথা নিশ্চিত জানা যায়, সেগুলি হল কপিশ, আবিসারেস, তক্ষশিলা এবং পুষ্পপুর। এদের মধ্যে পুষ্পপুরের অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল, বলা যায় না।

তক্ষশিলার শক নৃপতিদের বেশিরভাগ মুদ্রাই দ্বিভাষিক। মোগ বা মাওয়েস থেকে শুরু করে দ্বিতীয় অজ পর্যন্ত এই রাজাদের প্রবর্তিত মুদ্রায় মহারাজ, মহৎ রাজরাজ, রাজাতিরাজ ইত্যাদি উচ্চগ্রামী অভিধা ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের এই সব অভিধা গ্রহণের পিছনে ইন্দো-গ্রীকদের দৃষ্টান্ত অবশ্যই কাজ করেছিল। তাঁদের অধিকারভুক্ত বিস্তৃত এবং বিশেষভাবে তাঁদের অভিধার জন্য তক্ষশিলার শক শাসকগণকে 'সম্রাট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তক্ষশিলার শক শাসনের অবসান কীভাবে হয়েছিল ফিলোস্ট্রাটসের রচনায় তার আভাস পাওয়া যায়। (ফিলোস্ট্রাইস) খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তিনি টিয়ানার এ্যাপোলোনিয়াসের জীবনী লিখেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর এই এ্যাপোলোনিয়াস অঘটন ঘটাতে পারতেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ফিলোস্ট্রাটস লিখেছেন যে, যখন খ্রিস্ট ৪৩-৪৪ অব্দে তক্ষশিলায় যান, তখন তিনি সেখানকার সিংহাসনে ফ্রাওটেস নামক পার্থিয়কে দেখেন। অথচ খ্রিস্ট ৪৫ অব্দের তাখ্‌ত-ই-বাহি লেখতে তক্ষশিলার রাজ্য হিসাবে গন্ডোফারনেসের নাম পাওয়া গেছে।

অনুমান করা হয় ফ্রাওটেসের মৃত্যুর পরে গান্ডোফারনেস তক্ষশিলা অধিকার করেন। মার্শাল লিখেছেন যে, সর্বোত্তম মুহূর্তে শকস্থান (সিস্তান) সিন্দুদেশ, আরাকোসিয়া (কান্দাহার), দক্ষিণ ও পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পেশোয়ারের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে তখঈ-ই-বাহি লেখ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গন্ডোফারনেস শকদের ধরনে মুদ্রার প্রচলন করেন। এর থেকে, তিনি যে পশ্চিমে পাঞ্জাবের শক রাজ্য জয় করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কচ্ছ এবং কাথিয়াবাড় তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। গন্ডোফারনেসের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য সসন, আবদা গাসেথ, পাকোরেস, শতবস্ত্র, সপেদন, প্রহত প্রভৃতি নৃপতি রাজত্ব করেন। এঁরা সকলেই যে রাজ্যের সব অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, এমন নয়। পেরিপ্লাস-এ বলা হয়েছে যে তখন পার্থিয় নৃপতিগণ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিতাড়িত করেছিলেন। তৎকালীন মুদ্রায়ও রাজ্যের এই অবক্ষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁরা ভারতে আবির্ভূত হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল।

৪ক.৩.২ মথুরার ক্ষত্রপগণ

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মথুরায় সত্রপালের (ক্ষত্রপের) শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষত্রপগণের মধ্যে রাজুল এবং ষোড়শ, এই দুইটি নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ আজিলিসেস ও ক্ষত্রপ রাজুলের মুদ্রায় মথুরার লক্ষ্মীমূর্তি ব্যবহার দেখে ডঃ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, রাজুল আজিলেস-এর ক্ষত্রপ হিসাবে মথুরা জয় করেছিলেন এবং পরে ষোড়শ ইত্যাদি স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের ছাড়া শিবদত্ত, শিবঘোষ, হুগামাস, হগান প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। তাঁদের প্রকৃত স্থান রাজুল-ষোড়শের পরে।

মথুরার শক ক্ষত্রপদের জনট সেখানকার সিংহ-শীর্ষ স্তম্ভলেখ প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই লেখটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে তৎকালীন ক্ষত্রপ পরিবারের বংশপরিচয়ই পাওয়া যায় না, মথুরার বাইরে, অন্যত্র যে ক্ষত্রপগণ ছিলেন, তাদেরও কারও কারও নাম পাওয়া যায়।

রাজুল যেহেতু প্রথমে ক্ষত্রপ ও পরে মহাক্ষত্রপ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন, সেই হেতু তিনি যখন স্থানীয় রাজাদের কাছ থেকে মথুরা দখল করেন, তখন তিনি কোন শক-পার্থিয় নৃপতির অধীন ছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে রাজুল শুধু মথুরা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে নয়, তক্ষশিলা অঞ্চলে ক্ষত্রপ হিসাবে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাই মনে হয় যে প্রথমে তিনি তাঁর সমসাময়িক শক-পার্থিয় নৃপতি আজিলিসেসের অধীন থাকলেও পরে বোধহয় তিনি কার্যত স্বাধীন, অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় বোধহয় তক্ষশিলা অঞ্চলে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। অন্ততপক্ষে তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ষোড়াশের অধিকার মথুরা অঞ্চলের বাইরে খুব ছিল বলে জানা যায় না। শুধু রাজুল কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তাই নয়। উজ্জয়িনীর মহাক্ষত্রপগণও অনুরূপভাবে স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা প্রথমদিকে কুষাণদের অধীনে ছিলেন, এই অনুমানের সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তক্ষশিলার শক সম্রাটদের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য স্থানে স্বাধীন শক রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

রাজুলের মুদ্রাগুলি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ট্রাটোর মুদ্রার অনুকরণে রচিত। তাই মনে হয় যে, রাজুল পূর্ব পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পরে মথুরা অধিকার করেন। যে যে স্থানে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, পূর্ব পাঞ্জাব এবং মথুরা পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে ষোড়শের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় যে, মথুরা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। ষোড়শের পর অল্পসংখ্যক ক্ষত্রপ মথুরা শাসন করেন। এর অল্পকাল পরে কুষাণগণ মথুরা জয় করে।

৪ক.৩.৩ সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ

শক-পার্থিয়দের সময় পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষে ক্ষত্রপ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রপদের কোন নাম পাওয়া যায়নি। কুষাণদের সময় এই অঞ্চলে ক্ষত্রপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ক্ষত্রপগণ ক্ষহরত এবং কার্দমক, এই দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ক্ষহরতদের মধ্যে অর্ত, ভূমক এবং নহপাণ, এই তিনজন ক্ষত্রপের কথা জানা যায়। সে তুলনায় চষ্টন প্রতিষ্ঠিত কার্দমক শাখার ক্ষত্রপ সংখ্যা ছিল অনেক।

কখন এবং কীভাবে শকগণ পশ্চিম ভারতে এসেছিল, তা নিশ্চিত বলা যায় না তবে তাদের মুদ্রায় প্রথম থেকে খরোষ্ঠীর ব্যবহার দেখে বলা যায় যে, তারা উত্তর অঞ্চল থেকে এসেছিল।

পশ্চিম ভারতে দুইটি ক্ষত্রপ শাখার মধ্যে ক্ষহরত শাখা খুবই স্বল্পায়ু। এই শাখার সদস্য সংখ্যা মাত্র দুই, ভূমক এবং নহপাণ। ভূমক সম্পর্কে যা কিছু তথ্য, তা শুধু তাঁর মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়। তিনি ক্ষত্রপ হিসাবে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর কোন মুদ্রায় "রাজ্য" অথবা "মহাক্ষত্রপ" অভিধা পাওয়া যায় না। অবশ্য নহপাণের মুদ্রায় "রাজা" অভিধা পাওয়া যায়। অর্ত ও ভূমকের মুদ্রা গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং মালব অঞ্চলে পাওয়া গেছে। ভূমক এবং নহপাণের মুদ্রা তুলনামূলক আলোচনা থেকে র‍্যাপসন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভূমক নহপাণের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল, বলা যায় না। তবে সময়ের দিক থেকে দুই জনের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। ভূমকের মুদ্রায় ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী উভয় লিপির ব্যবহার দেখে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে, ভূমক বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করতেন। ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে পরিচিত পশ্চিম রাজপুতানা এবং সিন্ধুও তাঁর শাসনাধীন ছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, অর্ত ও ভূমক খরোষ্ঠী প্রধান অঞ্চল থেকে এসেছিলেন বলে তাঁদের মুদ্রায় ব্রাহ্মী ছাড়াও খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভূমকের অধিকৃত এলাকার মধ্যে সিন্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করা বোধহয় সম্ভব নয়। কেননা পেরিপ্লাস-এ আছে যে, নহপাণের শাসনকালে পার্থিয়গণ সিন্ধুতে যুদ্ধ করছিল।

নহপাণের জন্য তাঁর বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা, অল্পসংখ্যক তাম্র মুদ্রা, জামাতা উসবদাতের এবং মন্ত্রী অয়ম'র লেখ এবং পেরিপ্লাস-ই প্রধান উপাদান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মুদ্রায় কোন তারিখের উল্লেখ নেই। তাই তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে এই মতভেদ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে মূল বিষয় সম্পর্কে নয়। নাসিক জেলার অন্তর্গত জোগালথেম্বিতে নহপাণের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। তার দুই-তৃতীয়াংশ (নয় হাজারের বেশি) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত। এ থেকে দুইটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, নহপাণ এবং গৌতমীপুত্র সমসাময়িক ছিলেন এবং দুই, গৌতমীপুত্রের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। উসবদাতের বিভিন্ন লেখতে যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, নহপাণের শাসন উত্তরে রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কাথিয়াবাড়, দক্ষিণ-গুজরাট, পশ্চিম-মালব, উত্তর-

কঙ্কন এবং নাসিক-পুনা অঞ্চল তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্রের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষহরত শাখার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। গৌতমী বলশ্রী রচিত নাসিক প্রশস্তি-এ তাঁর পুত্র ক্ষহরতদের উচ্ছেদসাধন করেছিলেন, এমন কথা আছে। গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে রচিত নাসিকলেখ থেকে জানা যায় যে, উসবদাতের অধিকারভুক্ত একটি গ্রামের অংশ তিনি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। *পেরিপ্লাস* থেকে জানা যায় যে, নহপাণের রাজধানী ছিল মীননগর। তখন এই নামে দুইটি নগর ছিল। একটি সিন্ধুনদের বদ্বীপে, সিন্ধুতে, অন্যটি বারিগাজার উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে। মনে হয় দ্বিতীয়টি তাঁর রাজধানী ছিল। অনেকে এর সঙ্গে মীনদলপুর বা মান্দাশের অঞ্চলের একীকরণ করে থাকেন।

নহপাণের সময় যুদ্ধবিগ্রহের কথা বিশেষ জানা যায় না। অয়ন'র লেখতে উসবদাত কর্তৃক 'মলয়দের' পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এটিই তাঁর শাসনকালের একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকেরা তাই অনুমান করেন যে, নহপাণ যে বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করতেন, তার বেশিরভাগ, তাঁর পূর্বে অন্য কেউ জয় করেছিলেন।

পেরিপ্লাসে আছে যে, নহপাণের সময় ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় বণিকগণ তখন মিশরে যেতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ হয়তো সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। পেট্রি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি বৌদ্ধ প্রস্তর সমাধি আবিষ্কার করেন। মনে হয় এই সমাধির নীচে কোন ভারতীয় বণিক চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। বারিগাজা বন্দর এবং তার পশ্চাৎ প্রদেশ কাথিয়াবাড় নহপাণের অধিকারভুক্ত থাকায় মনে হয় যে, নহপাণ পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরও তাঁর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ছিল।

পেরিপ্লাসে বারিগাজা বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা আছে। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে আছে, রাজার জন্য রৌপ্যপাত, গায়ক-গায়িকা, উৎকৃষ্ট মদ এবং প্রসাধন সামগ্রী। এ থেকে বোঝা যায় যে, নহপাণ বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন। এইসব গায়ক-গায়িকার ভারতীয় সমাজে কী স্থান ছিল, বলা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, শক সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। তক্ষশিলায় কনিষ্কের স্তূপ নির্মাতা আগেসিলাওস একজন ক্রীতদাস ছিলেন।

৪৫ অব্দের একটি লেখতে নহপাণকে ক্ষত্রপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে রচিত অময়'র জুন্নার লেখতে তিনি "রাজা মহাক্ষত্রপ স্বামী" বলে অভিহিত হয়েছেন। নহপাণ বিষয়ক এটিই শেষ লেখ। তাই মনে হয় যে, পতনের পূর্বে তিনি এই মহত্তর অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

নহপাণের রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অয়ম নামে তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন। উসবদাতের নাসিকলেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ-গুজরাট এবং উত্তর-কোঙ্কনের প্রদেশপালরূপে কাজ করতেন।

গৌতমীপুত্র যেসব মুদ্রা পুনর্মুদিত করেন, তার মধ্যে নহপাণ ভিন্ন অন্য কারও একটি মুদ্রাও পাওয়া যায়নি। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, তিনিই ছিলেন ক্ষহরত শাখার শেষ শাসক।

৪ক.৩.৪ পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণ

মালবে চষ্টন যে ক্ষত্রপ শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন, তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। এবং এদেশের রাজনীতি

ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চষ্টন এবং তাঁর বংশধরগণ তাঁদের লেখ এবং মুদ্রায় শকাব্দ (খ্রিস্টপূর্ব ৭৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত) ব্যবহার করেছেন।

সময়ের দিক থেকে নহপাণ এবং চষ্টনের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। চষ্টনের মুদ্রায় উৎকীর্ণ মস্তকের সঙ্গে নহপাণের মুদ্রায় উৎকীর্ণ মস্তকের বিশেষ মিল আছে। কার্দমক শাখার চষ্টনই একমাত্র শাসক যাঁর মুদ্রায় গ্রীক, খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী, ত্রিবিধ লিপির ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য গ্রীক এবং খরোষ্ঠী অচিরেই তাদের গুরুত্ব হারিয়েছিল। চষ্টনের মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপি শুধু তাঁর নাম উৎকীর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর পরে এই রীতিও বিলুপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে শুধুমাত্র অলংকরণ ভিন্ন মুদ্রার অন্যত্র গ্রীক চিহ্ন পাওয়া যায় না। মুদ্রার এই ক্রমবিবর্তন বিদেশীদের ভারতীয়করণের অভ্রান্ত দলিল হয়ে আছে।

চষ্টনের বিভিন্ন মুদ্রা থেকে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্র অথবা সাতবাহনের কাছ থেকে কিছু অঞ্চল জয় করেন। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কচ্ছের অন্তর্গত আন্ধাউ নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর পৌত্র রুদ্রদামনের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই লেখ থেকে আরও জানা যায় যে, রুদ্রদামন জয়দামনের পুত্র ছিলেন। জয়দামনের মুদ্রায় তাঁকে 'ক্ষত্রপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, মহাক্ষত্রপ আখ্যা দেওয়া হয়নি! তাই অনেকে মনে করেন যে, জয়দামনের শাসনকালে সাতবাহনদের হাতে শকদের বিপর্যয় ঘটেছিল। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখকে এই অনুমানের পরিপোষক মনে হয়। কেননা সেখানে বলা হয়েছে যে রুদ্রদামন স্বয়ং মহাক্ষত্রপ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন (স্বয়মধিগত মহাক্ষত্রপ নাম) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান সত্য বলে মনে হয় না, কেননা চষ্টনের জীবদ্দশাতেই জয়দমনের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি কখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন নি। তিনি কোন রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রপ হিসাবে তিনি অল্পকাল কাজ করেছিলেন।

মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জন্য জুনাগড় লেখ প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান। এই লেখটি আগাগোড়া সংস্কৃত গদ্যে, কিন্তু কাব্যরীতিতে রচিত। পাশাপাশি সাতবাহনদের লেখগুলি কিন্তু সাধারণের ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং বলা চলে যে, পশ্চিম ভারতে শক-ক্ষত্রপদের শাসনকালে সংস্কৃত ধীরে ধীরে প্রাকৃতের স্থান গ্রহণ করেছিল। এই লেখ থেকে রুদ্রদামনের ব্যক্তিগত গুণাবলী, রাজ্যজয় এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়। এই লেখতে রুদ্রদামনের রাজপদে নির্বাচিত হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আন্ধাউ লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ইতিপূর্বে চষ্টনের সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামন যে সকল স্থানের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, অর্থাৎ যে স্থানগুলি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় যে নামগুলি আছে, সেগুলি হল ঃ পূর্বাপর আকরাবন্তী (পূর্ব এবং পশ্চিম মালব), অনুপনিভৃৎ (মাহিশ্মতি অঞ্চল), সুরাষ্ট্র (জুনাগড়ের চতুষ্পার্শে), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়), অপরান্ত (উত্তর কঙ্কন), অনারত্ত (দ্বারকা সংলগ্ন), শ্বভ্র (সবরমতী নদীতীরে) মরু (মারোয়াড়), কচ্ছ, সিন্ধু সৌরীর (নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা) এবং নিষাদ (সরস্বতী এবং পশ্চিম বিন্ধ্য অঞ্চল)।

এই তালিকা থেকে মনে হয়, একদা নহপাণ যে অঞ্চলগুলি শাসন করতেন, রুদ্রদামন তাদের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এমনও হতে পারে যে, নহপাণের অধীন যে নৃপতিগণ গৌতমীপুত্র কর্তৃক অঞ্চলচ্যুত

হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের পুনর্বাসন ঘটিয়েছিলেন। কেননা জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামনকে "'ভ্রষ্টরাজ প্রতিষ্ঠাপক" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শুধু যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়েই নয়, জনকল্যাণমূলক কাজেও রুদ্রদামন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে সুদর্শন হ্রদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় নির্মিত এবং অশোকের সময় যবনরাজ তুষাষ্ফ কর্তৃক সম্প্রসারিত হয়, তাঁর সময়ে প্রচণ্ড ঝড়ে এটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রুদ্রদামন তাঁর পার্থিয় মন্ত্রী সুবিশাখের সাহায্যে এটির সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন। অথচ এজন্য তিনি কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করেন নি। এমনকি শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেও তিনি বাধ্য করেন নি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অধিকার খুব কম ছিল না। জুনাগড় লেখতে বলা হয়েছে যে, শব্দ (ব্যাকরণ), অর্থ (রাজনীতি শাস্ত্র), গন্ধর্ব (সঙ্গীত) এবং ন্যায়ের (তর্কশাস্ত্র) উপর বিশেষ অধিকারের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উজ্জয়িনী নগর তাঁর রাজধানী ছিল।

রুদ্রদামনের পরে মালবের শক-ক্ষত্রপদের ইতিহাসে আকর্ষণীয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর পরবর্তী মহাক্ষত্রপ অথবা ক্ষত্রপগণ যেসব মুদ্রা প্রচলন করেন, সেগুলিতে তাঁদের পিতার নাম এবং সরকারি পদবীর উল্লেখ থাকায় এই সময়ের শাসকদের ক্রমপরম্পরা এবং শাসনকাল অনেকটা নিশ্চিত।

রুদ্রদামনের পরবর্তী শক-ক্ষত্রপদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ৪৫ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৫-৩৪০ অব্দ) ব্যাপী শক রাজ্যে কোন মহাক্ষত্রপ ছিলেন না। র‍্যাপসন মনে করেন যে, পশ্চিমের ক্ষত্রপগণ কোন বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। এখন জানা গেছে যে, এই সময় শকদের ইরানের স্যাসানীয় বংশের রাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ব্যাপকতর দৃষ্টিতে বিচার করলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শকদের অবদান ছিল খুবই বেশি। তাঁরা পারসিক-পার্থিব সংস্কৃতির বাহক হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এদেশে তাঁরা ইন্দো-গ্রীক সংস্কৃতির ধারক হয়েছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান হওয়ায় ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছিল এবং গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছিল। এইভাবে এ যুগে যে সংস্কৃতি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাই গুপ্ত যুগের সাফল্যকে সম্ভব করেছিল।

৪ক.৪ কুষাণ সাম্রাজ্য

পার্থিয়দের পতনের সঙ্গে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক আধিপত্যের অবসান ঘটেনি। পার্থিয়দের পরে কুষাণরা এসেছিলেন। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থিয়দের বিতাড়িত এবং উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কুষাণগণ যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত এবং অন্যদিকে চীন সাম্রাজ্যের প্রান্ত স্পর্শ করে। কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দীর বেশি এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল, যদিও এর গৌরবময় কাল এক শতাব্দীর বেশি নয়। দীর্ঘকালব্যাপী কুষাণদের কার্যকলাপ ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণগণ ভারতের সীমান্ত পরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। কুষাণগণ

যেমন একদিকে বিদেশী ভাবধারার বাহকরূপে এদেশে এসেছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় ভাবধারাও অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতিতে কুষাণদের অবদান তাই সমধিক এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কুষাণ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন কাহিনী বিশেষ আকর্ষণীয়।

শক-পার্থিয়দের তুলনায় কুষাণদের জন্য ইতিহাসের উপাদান পরিমাণে বেশি। দেশীয় এবং বৈদেশিক, বিশেষত চৈনিক সাহিত্য, এক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। চৈনিক সাহিত্য বলতে প্রধানত বোঝায় সু-মা-কিয়েন সংকলিত *সি-চি* (ঐতিহাসিক দলিল), প্যান-কু রচিত *ছিয়েন-হান-সু* (প্রথম হান বংশের ইতিহাস), ফ্যান-ই রচিত *হৌউ-হান সু* (পরবর্তী হান বংশের ইতিহাস) এবং মা-তোয়ান-লিন রচিত *বিশ্বকোষ* (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী)। স্ট্যাবো, জাস্টিন, বর্দেসানিস, আম্মিয়ানুস, মার্সেলাইনুস প্রভৃতির গ্রন্থে ইউচিদের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস কিছু জানা যায়। আর্মেনীয় সাহিত্যের কয়েকটি বই, টবরীর গ্রন্থ এবং কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের সাহায্য করে। এই গ্রন্থগুলি ছাড়া মুদ্রা, লেখ (প্রধানত প্রাকৃত ও ব্যাকট্রিয় ভাষায় রচিত) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন এ যুগের ইতিহাস রচনার সহায়ক।

সি-চি এবং ছিয়েন-হান-সু'র সাক্ষ্য অনুযায়ী কুষাণ ছিল ইউচি উপজাতির অন্যতম শাখা। ইউচিদের আদি বাসস্থান ছিল টুন-হুয়াং ও ছি-লিয়েন পাহাড়ের (অর্থাৎ বর্তমান চীনের কান-সু অঞ্চলের টুন-হুয়াং ও নানলান পাহাড়ের) মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দ বা তার কাছাকাছি সময় (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৪-১৬০ বা ১৫৮ অব্দের মধ্যে) হিয়ুং-নু (পরবর্তীকালের হুণ উপজাতি) কর্তৃক পরাজিত হয়ে ইউচিগণ পশ্চিম দিকে অভিপ্রয়াণ আরম্ভ করে। ডঃ মুখোপাধ্যায় সি-চি ও ছিয়েন হান-সুতে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৯ অব্দের পূর্বে ইউচিরা তা-হিয়া দখল করেছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, তা-হিয়া বলতে বোঝাত, ওয়াখান, বাদাখসান, চিত্রল, কাফিরিস্থান এবং তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ এক কথায় যে অঞ্চল প্রাচীনকালে পূর্ব ব্যাকট্রিয়া নামে পরিচিত হতে পারত। সুতরাং ইউচিরা গ্রীক বা তাদের সমগোত্রীয়দের কাছ থেকে পূর্ব ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ দখল করেছিল, এই অনুমানে কোন বাধা নেই। ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে (তা-হিয়া সহ) গ্রীক রাজত্বের সমাপ্তি ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৯ অব্দের মধ্যে।

৪ক.৪.১ কুজুল কদফিস

হোউ-হান শু'র সাক্ষ্য অনুসারে, তা-হিয়া দখলের এবং ইউচিনের পাঁচটি শাখার মধ্যে তা-হিয়া বিভক্ত হওয়ার একশো বছরের কিছু পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু পরে ছিউ-চিউ-ছুয়ে বা কুজুল কদফিস কুষাণদের নেতা হন। কিন্তু তিনি বোধহয় কুষাণদের প্রথম স্বাধীন নেতা ছিলেন না। মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, কুষাণদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে, প্রথম ইউচি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নাগপাশমুক্ত স্বাধীন কুষাণ ছিলেন মিয়াওস। তিনি কুজুল কদফিসের পূর্বে এবং প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করেছিলেন।

কুষাণদের পরবর্তী জ্ঞাত রাজা হচ্ছেন ছিউ-চিউ-ছুয়ে বা কিউ-সিউ-কিও। একে পুরাতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জ্ঞাত কুষাণ রাজা কুজুল কদফিসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। হৌ-হান-শু থেকে জানা যায় যে তিনি কুষাণ অঞ্চলের নেতা হওয়ার পর তা-হিয়াস্থ অন্যান্য ইউচি শাখাদের অধীন অঞ্চলগুলি জয় করেন এবং নিজেকে তাদের "রাজা" বলে ঘোষণা করেন। হৌন-হান-শু গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কুজুল কদফিস আন-সি (বা আরসাকেস বংশ শাসিত পার্থিয়া রাজ্য) আক্রমণ করেন এবং কাও-ফু (কাবুল অঞ্চল), পু-ত (পেশোয়ারের

দক্ষিণ-পূর্বে কাবুলের অদূরবর্তী একটি স্থান, অথবা খুব সম্ভবত ব্যাট্রা বা বাল্‌খ্‌ অঞ্চল, অর্থাৎ পশ্চিম ব্যাকট্রিয়ার একাংশ) এবং কি-পিন (কাশ্মীরসহ ভারতীয় উপদেশ-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগের একটি অঞ্চল) দখল করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পার্থিয় সাম্রাজ্য খ্রিঃ ২২৮ অব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। সুতরাং তিনি সমগ্র পার্থিয় সাম্রাজ্য জয় করেন নি। তিনি এই সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ জয় করেছিলেন। প-ত বা পশ্চিম ব্যাকট্রিয়ার একটি অংশ এই সময় বোধহয় আর্সাকীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তিনি পু-ত অঞ্চল আর্সাকীয়দের কাছ থেকে জয় করেছিলেন।

কুজুল কদফিস ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর অধিকার স্থাপন করেন, ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। কি-পিন বা কাশ্মীরসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চলের অন্তত কিছু অংশ তিনি জয় করেছিলেন। এই অংশের মধ্যে প্রাচীন গান্ধার (অর্থাৎ পেশোয়ার জেলা ও তক্ষশিলা অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল বা অঞ্চলগুলি তিনি জয় করেন ভারতীয় পহ্লব অথবা ইন্দো-পার্থিয় নৃপতি গন্ডোফারনেস বা তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে প্রথম শতকের প্রথম ভাগে।

কুজুলের রাজত্বকাল সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, কেননা, *হৌন-হান-শু*-তে বলা হয়েছে যে, তিনি ৮০ বৎসরেরও বেশি বয়সে মারা যান। তাঁর রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অতিবাহিত হয়েছিল মনে করা যায়। চৈনিক তথ্য অনুযায়ী কুজুলের মৃত্যুর পর কুষাণ রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন বিম কদফিস।

৪ক.৪.২ বিম কদফিস

বিম কদফিস পার্থিয় সম্রাট এবং ইন্দো-পার্থিয়দের পরাজিত করে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর মুদ্রায় বেদির সামনে উৎসর্গরত রাজার যে চিত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পার্থিয় নৃপতি গোটার্জেসের (খ্রিঃ ৩৮-৫১ অব্দ) মুদ্রার হুবহু মিল পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে, তিনি গোটার্জেস, বা তাঁর অববহিত পরবর্তী কোন পার্থিয় রাজার অধিকারভুক্ত এলাকার কিছু অংশ জয় করেছিলেন। মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে ডঃ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, তিনি ইন্দো-পার্থিয়দের কাছ থেকে আরকোসিয়া অর্থাৎ কান্দাহার এলাকা এবং সেন-টু অধিকার করেন। সেন-টু বলতে এতদিন সাধারণভাবে ভারত উপমহাদেশ বোঝাত। এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন জানা গেছে যে, কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বে সেন-টু ছিল একটি নদীর উপর এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকা। সেন-টু এখন কেবল নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা বোঝায়। মথুরায় কুষাণ রাজাদের দেবকুলে প্রাপ্ত বিম কদফিসের মূর্তি এবং তার পাদদেশে উৎকীর্ণ লেখটি ঐ অঞ্চলে কুষাণদের অধিকার বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়।

বিম কুষাণ মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি নতুন ওজন রীতির ভিত্তিতে তাম্রমুদ্রা তৈরি করান। এছাড়া রোমক ওজনরীতি অনুসরণ করে তিনি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। দুই কারণে এই ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তাঁর আগেকার স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা খুবই বিরল। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা তাঁর পরবর্তী কুষাণ শাসকগণ, এমনকি গুপ্তগণও অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে রোম থেকে প্রচুর স্বর্ণ আমদানির ফলেই এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মুদ্রা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

তাঁর মুদ্রায় 'মহীশ্বর' (অর্থাৎ মহেশ্বরের ভক্ত) কথাটি পাওয়া যায়। তা থেকে মনে করা হয় যে, তিনি শৈব ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁর মুদ্রার গৌণ দিকে কেবল শিবের মূর্তি দেখা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসের রাজ্যজয়ের ফলে ভারতের সঙ্গে চীন ও রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থলবাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। ব্যাকট্রিয়া-কাবুল উপত্যকা পাঞ্জাব যমুনা ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য এই বাণিজ্যকে সম্ভব করে। এই বাণিজ্যসীমার এক প্রান্তে ছিল ইউফ্রাটেস নদী এবং অপর প্রান্তে গঙ্গা নদী। রোম এবং পার্থিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তিচুক্তি (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ অব্দ) এই বাণিজ্যকে সাহায্য করে। ভারতীয় রেশম, মশলা এবং মণিমুক্তার বিনিময়ে রোম থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতে আসে।

৪ক.৪.৩ প্রথম কনিষ্ক

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ভারতীয় এবং বৈদেশিক সাহিত্যে, এমনকি মুদ্রা এবং লেখতেও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে মুদ্রাবিশারদগণ মনে করেন যে, কনিষ্ক গোষ্ঠীর রাজারা কদফিস গোষ্ঠীর পরে এসেছিলেন। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, কনিষ্কের সিংহাসন লাভের তারিখ থেকে একটি নতুন অব্দের প্রচলন হয়েছিল।

ডঃ বি. এন. মুখার্জীর মতে দ্বিতীয় কদফিস আরসাকীয় রাজা দ্বিতীয় গোটার্জেসের (৩৮-৫১ খিস্টাব্দ), এক শ্রেণীর মুদ্রার নকসা তাঁর নিজের মুদ্রার মুখ্যদিকে অনুকরণ করেছিলেন। দ্বিতীয় গোটার্জেসের মুদ্রায় অগ্নিকুণ্ডের সামনে রাজার উৎসর্গরত যে চিত্র আছে, দ্বিতীয় কদফিসের মুদ্রায়ও তা পাওয়া গেছে। এবং যেহেতু প্রথম কনিষ্ক দ্বিতীয় কদফিসের পরে রাজা হন, সেইহেতু তাঁকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বস্থান দেওয়া যায় না। ডঃ বি. এন. মুখার্জী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আনুমানিক খ্রিঃ ২৬২ অব্দে সাসানীয় রাজা প্রথম সাপুর তাঁর নকস-ই-রুস্তম লেখতে কুষাণদের উপর তাঁর আধিপত্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে কুষাণদের চূড়ান্ত পতন হয়েছিল। তা যদি হয় এবং কনিষ্কের রাজত্বের সূচনা ও কুষাণদের পতনের মধ্যে এক শতাব্দীরও বেশি (প্রথম কনিষ্ক থেকে প্রথম বাসুদেব + ৯৮ বৎসর = তৃতীয় কনিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেবের রাজত্বকাল) ব্যবধানের কথা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে কণিষ্কের রাজত্বের সূচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পরে আনা যায় না। তাহলে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ, এই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সময়সীমার মধ্যে কনিষ্কের রাজত্ব শুরু হয়েছিল, বলা যায়। এই অল্প পরিসারের মধ্যে শকাব্দ ভিন্ন যেহেতু অন্য কোন অব্দের কথা জানা যায় না, সেইহেতু কনিষ্কই শেষোক্ত অব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে, কনিষ্কের রাজত্বকালে প্রবর্তিত অব্দ পরে শকাব্দ নামে পরিচিত হয়েছিল। তাই ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্কের শাসন শুরু হয়ে থাকতে পারে। অন্ততপক্ষে ঐ অব্দের সূচনা তাঁর শাসনকালের মধ্যেই হয়েছিল, মনে হয়। তিনি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ অব্দের প্রতিষ্ঠা নাও করে থাকেন, তাহলেও তাঁর রাজ্য সম্বৎসর অনুযায়ী কাল গণনার রীতি, তাঁর পরেও কুষাণ সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল বলে ধরে নিতে হবে। এই গণনারীতিই পরে নিয়মিত একটি অব্দে পরিণত হয়েছিল। কনিষ্ক ঐ অব্দের অন্তত ২৩ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে প্রথম কনিষ্ক নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমন কথাও বলা হয়েছে যে তাঁর মধ্যে

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধোন্মাদনা এবং অশোকের ধর্মীয় উদ্দীপনার সমাবেশ ঘটেছিল। দ্বিতীয় কদফিসের পরে তিনি সিংহাসনে এসেছিলেন।

কনিষ্ক বিম কদফিসের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও নতুন রাজ্যজয়েরও প্রয়াসী ছিলেন। কুমারলাতর *কল্পনামণ্ডটিকা*-র (আনুমানিক দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে) চৈনিক অনুবাদে কনিষ্ক কর্তৃক টুং-টিয়েন-চু জয় এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা আছে। টুং-টিয়েন-চু বলতে পূর্ব ভারতের অংশবিশেষ বোঝায়। চৈনিক এবং তিব্বতী উপাদানের ব্যাখ্যা থেকে জানা গেছে যে, তিনি সাকেত (অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্রের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পাটলিপুত্র থেকে তিনি অশ্বঘোষকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। সারনাথ এবং সাহেত মাহেত অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত তাঁর লেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলগুলি তাঁর অধিকারে এসেছিল। পূর্ব ভারতে পাটলিপুত্র অতিক্রম করে তাঁর তাম্রমুদ্রা পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেচে। ডঃ সরকার, ডঃ বি. এন. মুখার্জী প্রভৃতি মনে করেন যে শুধু এই তথ্যের উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলগুলি যে তাঁর রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বলা যায় না। অনেকে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে কনিষ্কের সৈন্যবাহিনী পাটলিপুত্র অতিক্রম করে এইসব অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এই মুদ্রাগুলি স্থানীয় টাকশালে তৈরি হয়ে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। পেশোয়ার, সুইবিহার, জেডা (উন্দের নিকট) এবং মানিকিয়ালায় (রাওয়ালপিন্ডির নিকট) প্রাপ্ত কনিষ্কের খরোষ্ঠী লেখ থেকে জানা যায় যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, উত্তর সিন্ধুদেশ এবং গান্ধার তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম ভারতের মালব ও সুরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপদের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। বিশেষত চষ্টনের বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও অনিশ্চিত।

আলবেরুনি আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলের উপর তাঁর অধিকার সম্পর্কিত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। *রাজতরঙ্গিনী* এবং কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থে কনিষ্কের কাশ্মীর শাসনের উল্লেখ আছে। একটি বৌদ্ধগ্রন্থের চৈনিক অনুবাদে পার্থিয়ার সঙ্গে কনিষ্কের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে পার্থিয় রাজার নামোল্লেখ নেই। কারও কারও মতে এই রাজা ছিলেন পাকোরাস (৭৭-১০৫ খ্রিস্টাব্দ)। অনেকে মনে করেন যে, কনিষ্ক পার্থিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করেন। পার্থিয়ার রাজা পশ্চিম দিকে কনিষ্কের অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। আবার অনেকের মতে পার্থিয়ার বিরুদ্ধে কনিষ্কের ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক এবং পার্থিয়ার রাজা সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

উত্তরে চীনের সঙ্গে কনিষ্কের সম্পর্ক কি ছিল, এ বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। অনেকের মতে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন এবং এর ফলে কাসগড়, ইয়ারকন্দ এবং খোটান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার অনেকে এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, চীনের সেনাপতি প্যান চাও ১০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সিনকিয়াং-এর উপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুতরাং কনিষ্ক এই অঞ্চলগুলি অধিকার করেছিলেন, তা বলা যায় না। তবে মনে হয় যে কনিষ্ক তাঁর তেইশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের প্রথম দিকে হয়তো এই অঞ্চলে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, কনিষ্কের সাম্রাজ্য জুংলিং পর্বতের, অর্থাৎ পামীরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আরও লিখেছেন যে, পীত নদীর পশ্চিমস্থ অঞ্চলের উপজাতিরা কনিষ্কের কাছে প্রতিভূ পাঠিয়েছিল। তবে চীনের বিরুদ্ধে এই সাফল্য হয়তো স্থায়ী হয়নি।

চৈনিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কনিষ্ক বিভিন্ন দিক জয় করেছিলেন, শুধু উত্তরাঞ্চল অপরাজিত ছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে কনিষ্ক একটি বৃহৎ অভিযান পরিচালনা করেন এবং জুলুং গিরিপথ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁর রাজ্যজয় পরিকল্পনা ঘোষণা করায়, জনগণ তাঁকে হত্যা করেন। এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও, এর মধ্যে তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হওয়ায়, তাঁর ব্যর্থতার আভাস আছে, একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।

সাধারণত বলা যায় যে আক্সাস থেকে গঙ্গা, মধ্য এশিয়ার খোরাসান থেকে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত বেনারস পর্যন্ত বিশাল এলাকা কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। কুষাণগণ ভূতপূর্ব সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য অংশ, আফগানিস্তানের অধিকাংশ, প্রায় সমগ্র পাকিস্তান এবং সমগ্র উত্তর ভারত তাঁদের এক শাসনাধীনে এনেছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল এবং এক নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছিল।

দীর্ঘকাল ধরে কুষাণ সাম্রাজ্যকে বিদেশীদের দ্বারা শাসিত একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য মনে করা হত। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। ডঃ বি. এন. মুখার্জী ইত্যাদি গবেষকরা মনে করেন যে, ব্যাকট্রিয়াই ছিল কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে ভারত উপমহাদেশ প্রবেশের পূর্বে মধ্য এশিয়ার উল্লেখযোগ্য অঞ্চল কুষাণদের অধিকারে ছিল। এইসব তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য মনে হয় যে, কুষাণ সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না। মূলত এটি ছিল একটি মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ এই মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাত্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত উপমহাদেশে কুষাণদের রাজ্যজয়ের পিছনে মূল প্রেরণা কী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। অঞ্চল সম্প্রসারণের স্বাভাবিক উচ্চাশা তাদের রাজ্যজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ইয়েনকাও চেন অথবা কদফিস সেন-টু অর্থাৎ নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। পেরিপ্লাস-এ যে অঞ্চলকে "স্কুথিয়া" বলা হয়েছে, সেন-টু হয়তো তার অন্তর্গত ছিল। অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত পার্থিয়দের কাছ থেকে দ্বিতীয় কদফিস এই অঞ্চল জয় করেন। এর ফলে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমে এবং হয়তো পূর্বেও কতকাংশে, পার্থিয় অথবা ইন্দো-পার্থিয়দের শাসনের অবসান ঘটে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে এই জয়কে ভারতে ইন্দো-পার্থিয়দের পরিবর্তে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে হয়।

কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্য যে সময়ের, সেই সময়ের ভারত-রোম ব্যাপক বাণিজ্যের এবং নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা মনে রাখলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণের মধ্যে এই সম্প্রসারণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক উচ্চাশার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল মনে হয়।

পেরিপ্লাসে বাণিজ্য তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হোউ-হান-শু থেকে জানা যায় যে, ইউচি অধিকারের সময় সেন-টুর সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অবশ্য প্লিনির রচনা থেকে জানা যায় যে ৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎও ভারতের মধ্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং এর ফলে নাবিকেরা সরাসরি পেরিইয়ার নদীর মোহানার কাছাকাছি, মুজিরিস বন্দরে আসতে পারত। কিন্তু পেরিপ্লাস এবং হাউ-হান-শু থেকে জানা যায় যে, এই নতুন জলপথ আবিষ্কারের ফলে রাতারতি নিম্ন সিন্ধু

অঞ্চলের বন্দরগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। তাছাড়া পারস্য উপসাগর থেকে আগত নাবিকদের কাছে এই বন্দরগুলি ছিল প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীগণ এই বন্দরগুলির মাধ্যমে অতি দ্রুত পণ্য পাঠাতে পারত। শুধুমাত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নয়, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও এই বন্দরগুলি যোগ ছিল। সুতরাং বাণিজ্যের উপর কর ধার্য করে, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার যাঁরা নিয়ন্তা, তাঁরা প্রভূত সম্পদ আহরণ করতে পারতেন। এইজন্যে কুষাণদের এই অঞ্চলের গুরুত্ব উপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না।

ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা দ্বিতীয় কদফিসকে এই অঞ্চল জয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করলে তিনি চীনের প্রভাবমুক্ত এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রেশম বাণিজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পথ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কেননা এই পরিবর্তিত অবস্থায় চীন-রোম বাণিজ্যের জন্য ব্যবসায়ীদের খুব বেশি সংখ্যক বন্দর কর দিতে হবে না। তাছাড়া শক্তিশালী সরকার কর্তৃক সুরক্ষিত একটি নিরাপদ পথে তাদের পণ্য যাতায়াত করতে পারবে। মনে হয়, এইসব সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চহারে কর দিত এবং তার ফলে কুষাণদের পক্ষে প্রভূত সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয়েছিল। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তখন একদিকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এবং অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম দুনিয়ার অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তাই এই অঞ্চল অধিকারের মধ্য দিয়ে কুষাণগণ এই দ্বিবিধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের এবং তা থেকে লভ্যাংশ আদায়ের সুযোগ পেয়েছিল। হোউ-হান-শু বর্ণিত, সেন-টু জয়ের প্রকৃত তাৎপর্য এইখানে। ব্যাপক আর্থিক সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখে দ্বিতীয় কদফিস এই অঞ্চল জয় করেন এবং এর ফলে কুষাণ সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ নিঃসন্দেহে দৃঢ়তর হয়।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, ইতিহাসে কনিষ্কের খ্যাতি তাঁর রাজ্যজয়ের জন্য ততটা নয়, যতটা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। কনিষ্ক নিজে কখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে তাঁর মুদ্রা এবং পেশোয়ার সম্পুট লেখর উপর নির্ভর করে বলেছেন যে তিনি যদি পূর্বে নাও হয়, তাহলে অন্তত তাঁর রাজত্বকালের সূচনাতেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকের ধারণা যে, কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে পাটলিপুত্র জয়ের পর অশ্বঘোষের প্রভাবে তিনি এই ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরা মনে করেন যে অশোকের মতো কনিষ্ক যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেন। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই ধর্মান্তর গ্রহণের ফল এক হয়নি। অশোক এর পরে আর যুদ্ধ করেন নি। কিন্তু কনিষ্ক আমৃত্যু যুদ্ধ করেছিলেন।

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনের স্থান সম্পর্কে দুটি ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। একটি ঐতিহ্য অনুসারে স্থানটি ছিল কাশ্মীর কুন্দলবন বিহার, দ্বিতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরের কুবন বিহার। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক প্রথম ঐতিহ্যে আস্থাবান। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্র এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রবল আগ্রহবশত, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে এবং সেই মতবাদগুলির একটি সুসম্বদ্ধ ও বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অধিবেশনের আয়োজন করেন। কনিষ্কের রাজ্যসভার অন্যতম সদস্য, প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পার্শ্ব এবং প্রখ্যাত লেখক অশ্বঘোষের সহায়তায় এই সঙ্গীতি

প্রায় অসাধ্য সাধন করে। তারানাথ লিখেছেন যে, এই সঙ্গীতি আঠারোটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ দূর করে, ত্রিপিটক-এর অলিখিত অংশের লিখিত প্রথম রূপ দেয় এবং লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তি দূর করে। শুধু তাই নয় বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা হিসাবে অসংখ্য টীকা রচনা করা হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই টীকাগুলি বিভাষাশাস্ত্র নামে পরিচিত। তাই বলা যায় যে কেবল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সঙ্কলন ও সম্পাদনের জন্যই নয়, বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যার জন্যও এই সঙ্গীতি বিশেষ স্মরণীয়।

সঙ্গীতির এই অধিবেশনে বৌদ্ধ রূপান্তর ঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম (পরে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচ্য) জন্মলাভ করে। মনে হয় যে সংস্কৃতকে বৌদ্ধশাস্ত্রের বাহন হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে যে অভিজাত মনোভাব ছিল, বৌদ্ধধর্মের এই মৌলিক পরিবর্তনের পিছনেও সেই একই মনোভাব কাজ করেছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রত্যেককে 'আত্মদীপ' হতে বলেছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেকের আপন প্রয়াসে মুক্তি অর্জনের কথা বলেছিলেন। মুক্তি অর্জনের এই উপায়কে বৌদ্ধশাস্ত্রে "প্রত্যেক বুদ্ধ যান" বলা হয়েছে। প্রত্যেকের "বুদ্ধত্ব" লাভ ছিল এই যানের একমাত্র লক্ষ্য। পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য এত বৃহৎ ছিল না। এতে একদিকে পাপী মানুষ এবং অন্যদিকে বুদ্ধের মধ্যবর্তী বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে, এই বোধিসত্ত্বগণ তাঁদের পুণ্যকর্মের দ্বারা সমষ্টির মুক্তি ঘটাতে পারেন। এইভাবে প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিগত, নিরলস প্রয়াসের দ্বারা মুক্তি অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় যে, ধর্মচিন্তায় এইভাবে দায়ভাগ অবতারণার পিছনে অভিজানতমনের সহজ আয়াসবোধ কাজ করেছিল। বোধিসত্ত্বগণের সাহায্যে মুক্তিলাভের এই অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়, অর্থাৎ বোধিসত্ত্বযান, কালক্রমে 'মহাযান' নামে পরিচিত হয়েছিল। সার্বিক মুক্তি আদর্শ হওয়ায় এই যানকে মহাযান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যক্তির মুক্তি অণ্বিষ্ট হওয়ায় গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমতকে ঘৃণাভরে হীনযান বলা হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের এই মৌলিক পরিবর্তন বৌদ্ধশিল্পে প্রতিফলিত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধের আরাধনা মূর্তির মাধ্যমে করা হত না। এজন্য বুদ্ধের পদচিহ্ন, স্তূপ অথবা বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। এই বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধধর্মকে প্রধানত আশ্রয় করে ভারতে যে শিল্প গড়ে ওঠে, ইতিহাসে তা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। অন্য উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র ছিল মথুরা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে শিল্প ছিল ভারতীয়, কিন্তু শিল্পরীতির দিক থেকে তা ছিল গ্রীক প্রভাবিত। তাই এই রীতিতে নির্মিত বুদ্ধের মূর্তিকে অনেকাংশে গ্রীক দেবতা এ্যাপোলের মতো দেখাত। গান্ধার শিল্পের এই বিদেশী আঙ্গিক ভারতীয়গণ বেশিদিন প্রসন্ন মনে মেনে নেয়নি। গান্ধার শিল্পের তুলনায় মথুরায় শিল্পরীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের নিকটতর। আর একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বাহ্লীক দেশে।

কনিষ্ক উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এর ফলে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। ভারতের অভ্যন্তরে এর ফলে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু পূর্ব ভারতের পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু পূর্বের এবং পরের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যও স্থায়ী হয়নি। সেই তুলনায় বৌদ্ধধর্মে কনিষ্কের অবদানের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। পেশোয়ারে তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন, তা আলবেরুণির সময় পর্যন্ত, যুগপরম্পরায় বিদেশী পর্যটকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর দেবপালের সময়ের

একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, পেশোয়ারে তিনি যে সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেন, তা তখনও পর্যন্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। অপরপক্ষে কনিষ্কের সাম্রাজ্যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বাস্তিবাদী এবং মহাসঙ্ঘিক সম্প্রদায়গণ বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। মধ্য-এশিয়াতে এই ধর্মবিস্তারেও তাঁরা সাহায্য করেন। কনিষ্কের সমসাময়িক কালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের বাইরে, কুষাণ সাম্রাজ্যের নৈকট্য হেতু মধ্য এশিয়ায় এবং দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে, প্রথমে চীনে এবং পরে চীন থেকে কোরিয়ায় এবং জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল। তাই কনিষ্কের রাজ্যজয়ের গুরুত্বকে লঘু না করেও বলা যায় যে, ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপেই তাঁর খ্যাতি সমধিক।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কনিষ্কের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরমতসহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রায় গ্রীক, জোরায়াস্ট্রীয় প্রভৃতি দেবদেবীর অস্তিত্বই তার প্রমাণ। অনেকে মুদ্রায় দেবদেবীর এই বৈচিত্র্য দেখে মনে করেন যে, কনিষ্কের মনে বিভিন্ন ধর্মের সার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল।

৪ক.৪.৪ কনিষ্কের শাসনব্যবস্থা

কনিষ্ক রাজার দৈব অধিকারে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে "দেবপুত্র" বলে অভিহিত করেছেন। নীতিগতভাবে তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বৈরাচার নিরঙ্কুশ ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁর রাজকীয় অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তিনি তাঁর অনেক ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্র ও উপজাতি ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল।

কনিষ্ক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে শাসন না করে, ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপদের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা শাসন করতেন। তাঁর অব্যাহতির পূর্বে শক-পার্থিয়গণও এইভাবে তাঁদের রাজ্য শাসন করতেন। কনিষ্ক এক্ষেত্রে হয়ত পারস্যের সাম্রাজ্যশাসনব্যবস্থা দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে পারস্যসাম্রাজ্যের তুলনায় কুষাণসাম্রাজ্যের ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপগণ অধিকতর অধিকার ভোগ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষত্রপপদ বংশানুক্রমিক হতে পারত। এই ক্ষত্রপগণ কখনও বা 'রাজন' অভিধা গ্রহণ করতেন।

কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রশাসিত উপজাতিদের মধ্যে ভরতপুরের যৌধেয়গণের, আগ্রার নিকটবর্তী অর্জুনায়নগণের, সুরাষ্ট্রের আভিরগণের এবং রাজস্থান ও মালবের মালবগণের উল্লেখ করা চলে। বাহাওয়ালপুরের নিকটস্থ যৌধেয়গণের বসতি নিশ্চিতভাবে কনিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষের সুই বিহার লেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

কনিষ্কের মন্ত্রিপরিষদ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাথর। সূত্রালঙ্কা-এর দেবধর্ম নামে অপর একজন মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কনিষ্কের অন্যান্য পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন, অশ্বঘোষ, চরক এবং সংঘরক্ষা। অশ্বঘোষ ছিলেন কনিষ্কের আধ্যাত্মিক গুরু, চরক চিকিৎসক এবং সংঘরক্ষা পুরোহিত।

কনিষ্কের শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে 'গ্রামিক' বলা হত। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের 'শ্রেণী' অথবা 'গিল্ড' ছিল। এই গিল্ডগুলি বিভিন্ন বৃত্তির এবং ধর্মীয় দান সম্পর্কিত বিষয়ের দেখাশুনা করত। তাঁর অধীনে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ছিল। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি একদিকে রাজ্যজয় এবং অন্যদিকে

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ সেনাপতি বা দণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দণ্ডনায়কগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রদেশ-শাসনের কাজে সাহায্য করতেন। মানিকিয়ালা লেখতে লাল নামক একজন দণ্ডনায়কের নাম পাওয়া গেছে। সাম্রাজ্য-শাসনের কাজে তিনি বহুসংখ্যক কুষাণ, শক এবং গ্রীকদের নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের বেশিরভাগ ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আচারে আচরণে 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিলেন। কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও, অন্য ধর্মাবলম্বিগণের পূজা-পার্বণে কোন বাধা ছিল না। তাঁর মুদ্রায় যেমন একদিকে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়, তেমনই অন্যদিকে তাঁর রাজত্বকালে বহুসংখ্যক হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্মাণের কথাও জানা যায়।

৪ক.৪.৫ কনিষ্কের উত্তরাধিকারীগণ

কনিষ্কের রাজত্বের শেষভাগে বাসিষ্ক (২০-২৮ অব্দ) সহযোগী সম্রাট ছিলেন। কনিষ্কের পর তিনি সম্রাট হন। তিনি ২০-২৮ অব্দ অর্থাৎ ৯৮-১০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর হুবিষ্ক ২৬-৬০ অব্দ (অর্থাৎ ১৪০-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করলেও, তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি বিশেষ জানা যায় না। কেননা চৈনিক এবং ভারতীয় দলিলসমূহে তাঁর উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি লেখ মথুরা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পূর্ব আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে। অবশ্য তাঁর নামাঙ্কিত অসংখ্য স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রা তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সমৃদ্ধ রাজত্বকালের পরিচয় দেয়। কাবুলের প্রায় ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ওয়ারডক নামক স্থানে তাঁর একটি লেখ পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আফগানিস্তান তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে, তিনি কাশ্মীরে হুষ্কপুর নামে একটি নগর নির্মাণ করেন। এই স্থানটি ছিল কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরে, বরমূলা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে। স্টেইন বর্তমান উসকুর গ্রামকে প্রাচীন হুষ্কপুর বলে চিহ্নিত করেছেন। মথুরায় একটি অপূর্ব বিহার ছাড়াও, হুবিষ্ক হয়তো হুষ্কপুরে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

হুবিষ্কের সমকালীন আর একজন রাজা ছিলেন কনিষ্ক। এই দ্বিতীয় কনিষ্ক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। একমাত্র আরা লেখ ভিন্ন তাঁর অন্য লেখ পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় হুবিষ্কের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

হুবিষ্কের পর প্রথম বাসুদেব রাজা হন। খুব সম্ভবত তিনি হুবিষ্কের পুত্র ছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভারতীয় নাম ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। এ থেকে কুষাণগণ কীভাবে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যভাবে, 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায়। মুদ্রায় অঙ্কিত বাসুদেবের অঙ্গে বিদেশী পোশাকের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একান্তভাবে ভারতীয়। তবে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন শৈব। বলা যায়, তিনি দ্বিতীয় কদফিসের ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর মুদ্রায় বিদেশী দেবদেবীর উপস্থিতি ছিল না, এমন নয়, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। সে তুলনায় এককভাবে শিবের, অথবা যৌথভাবে শিব ও নন্দির নিদর্শন অনেক বেশি। সুতরাং তিনি যে শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম বাসুদেবের লেখ শুধুমাত্র মথুরা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর কোন লেখ পাওয়া যায়নি। তাই অনেকে মনে করেন যে, তাঁর রাজ্য এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম বাসুদেবের স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তাম্রমুদ্রার তুলনা করলে, তাঁর সময়ে অবনতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

স্বর্ণমুদ্রায় কোন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর তাম্রমুদ্রা নিশ্চিতভাবে হীন মানের। সেই সময় কুষাণসাম্রাজ্যের অবনতির আভাস অন্যভাবেও পাওয়া যায়। রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখ এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোসন-এর মঘদের উত্থান এবং কুষাণসাম্রাজ্যের অবনতি একই সময়ে ঘটেছিল।

প্রথম বাসুদেবের পরবর্তী কুষাণরাজাদের সম্পর্কে সাহিত্য উপাদান অথবা লেখ বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁদের বেশ কিছুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে এঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম বাসুদেবের পরে তৃতীয় কনিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেব ছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শক্তির (যেমন যৌধেয়, অর্জুনায়ন প্রভলতি উপজাতিসমূহের) বিদ্রোহের কথা বলে থাকেন। অন্যদিকে সাম্প্রতিক গবেষণার উপর নির্ভর করে এখন নিশ্চিত বলা চলে যে, মোটামুটিভাবে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় পাদে কুষাণসাম্রাজ্যের পতনের জন্য পারস্যের সাসানীয়গণ প্রধানত দায়ী ছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুষাণসাম্রাজ্য যখন সাসানীয়গণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখনই এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। কোন কোন ভারতীয় উপজাতি, অথবা স্থানীয় নরপতিগণ হয়তো এই সাম্রাজ্যের শবদেহের উপর প্রেতনৃত্যে মেতেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কুষাণসাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটাননি। তাঁরা শুধুমাত্র এর সমাধির পথকে মসৃণ করেছিলেন।

৪ক.৪.৬ কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতি

কুষাণযুগ উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই সংস্কৃতির মূল কথা হল স্বাঙ্গীকরণ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার, তেমনই এই স্বাঙ্গীকরণও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলেই বেশি হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের মানুষকে কুষাণদের কল্যাণে একই সাম্রাজ্য-কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছিল। এর ফলে একই ঐতিহ্য ও বন্ধন শুধু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই নয়, রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় প্রবণতা রক্ষিত হলেও কুষাণ-সংস্কৃতি প্রধানত বিভিন্ন ঐতিহ্যের সমন্বয়ের উপরই রচিত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের শেষ দিকে বিভিন্ন ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে, এর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

কুষাণগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তাঁদের সময় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যই প্রধান। স্থাপত্য শিল্প প্রধানত মন্দির এবং বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কুষাণগণ অসংখ্য চৈত্য, মন্দির, নগর, স্তূপ এবং বিহার নির্মাণ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণ ভারতে ইতিপূর্বে অনাদৃত ছিল না। কিন্তু এ যুগে ভারতীয় এবং বৈদেশিক শিল্পীগণ ধর্মীয় প্রয়োজনে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির নতুন সুযোগ লাভ করেছিলেন। প্রথম কনিষ্কের সময় নির্মিত পুরুষপুরের (পেশোয়ার) প্রখ্যাত চৈতের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে ফা-হিয়েন গান্ধার অতিক্রম করার সময় মুক্তকণ্ঠে এই চৈতটির প্রশংসা করেন। সুরখ কোটালে সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে, কুষাণসাম্রাজ্যের পশ্চিম বিভাগের মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে সেখানকার ধর্মরাজিক বিহারের নির্মাণকার্য দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। তরামেজের কারাটেপেতে খননকার্যের ফলে সমকালীন একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলের বিহার স্থাপত্যের কথা জানা গেছে।

কুষাণযুগে ভাস্কর্য বলতে প্রধানত উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার শিল্পরীতি বোঝায়। কিন্তু এই শিল্পরীতি প্রধান

হলেও, একমাত্র ছিল না। এর পাশাপাশি গান্ধারে উপত্যকায় মথুরায়, অন্ধ্রের অমরাবতীতে এবং মধ্য-এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ার বিভিন্ন শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধের জীবনকেন্দ্রিক এই শিল্পের উপর গ্রীস, রোম ও মধ্য-এশিয়ার প্রভাবের কথা বলা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশীয় ঐতিহ্য যে এই শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল, তা স্বীকার করা যায় না। এই শিল্পেই প্রথম বুদ্ধকে প্রতীকের পরিবর্তে, মূর্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। অনেকে এই মূর্তির উপর গ্রীক-দেবতা এ্যাপোলোর প্রভাবের কথা বলেছেন। এমনও বলা হয়েছে যে, এখানে ভাস্করের হৃদয় ছিল ভারতীয় কিন্তু তার হাত দুটি গ্রীসের। মধ্য-এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের শিল্পকে গান্ধার শিল্প প্রভাবিত করেছিল।

গান্ধার শিল্পের তুলনায় মথুরায় শিল্পরীতি ছিল বিশেষভাবে মৌলিক। বুদ্ধের মূর্তি ভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও এই শিল্পের উপজীব্য হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কুষাণ নৃপতিদের মূর্তিও এই শিল্পরীতিতে নির্মিত হয়েছিল। এমনকি বিহার-মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষকেরাও এই শিল্পের বিষয়বস্তু হয়েছিলেন। মথুরায় একটি প্রকৃত দেবকুল ছিল। এমনও হতে পারে যে, গান্ধার শিল্পের থেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং হয়তো তারও কিছুকাল আগে, মথুরার ভাস্কর্যে, বুদ্ধের উপর নরত্ব আরোপিত হয়েছিল। মথুরার বুদ্ধমূর্তিগুলিকে একই সঙ্গে এই জগতের এবং দূরের বলে মনে হয়।

কুষাণসাম্রাজ্যের বাইরে এই যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল অমরাবতী অঞ্চলে। এখানকার ভাস্কর্যকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপগুলির যথার্থ পরিপূরক বলা যায়। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী এই শিল্পের বিষয়বস্তু। কিন্তু এর সামগ্রিক সুর একান্তভাবে স্থানীয়। মনে হয় এখানকার শিল্পীরা শিল্পসম্পর্কিত যে অনুশাসনে আস্থাবান ছিলেন, তার প্রতি একান্তভাবে অনুগত থেকে এই শিল্পসৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে শিল্পীর প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। তবে উত্তর-ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য আমরাবতীর শিল্প কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ভূতপূর্ব সোভিয়েত রাশিয়ার এয়ারতম, খলচয়ন প্রভৃতি স্থান আফগানিস্তানের কয়েকটি জায়গায় ভাস্কর্যের নতুন নিদর্শন পাওয়া গেছে। রীতিগত বৈশিষ্ট্যে এই নিদর্শনগুলি সে যুগের গান্ধার, মথুরায়, এমনকি পার্থিব ও গ্রীক শিল্প থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। এই নিদর্শনগুলিতে দেখা যায় যে, মূর্তিগুলিকে অনেকটা সামনাসামনি (অর্থাৎ তির্যকভাবে নয়) উপস্থাপিত করা হয়েছে। এদের মুখের আকৃতি ডিমের মতো, চোখ দুটি ঈষৎ স্ফীত, উন্মুক্ত অথবা অর্ধ-নিমীলিত। মাথার চুল হয় অতিশয় কুঞ্চিত, না হয় নিপুণ ও গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত। 'ঐতিহাসিকেরা এই শিল্পরীতিকে 'ব্যাকট্রিয়' আখ্যা দিয়েছেন। একথা বলা যায় যে, এই স্বতন্ত্র ব্যাকট্রিয় শিল্পরীতির উদ্ভব সাম্প্রতিক কুষাণশিল্প-সম্পর্কিত আলোচনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

কুষাণযুগে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গুপ্তযুগে এই উন্নতি পূর্ণতা লাভ করেছিল। কুষাণযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের এই উৎকর্ষের সঙ্গে কনিষ্ক এবং প্রথম বাসুদেবের নাম বিশেষভাবে জড়িত। দশম খ্রিস্টাব্দের রাজশেখরের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি হয়তো এই প্রথম বাসুদেব। তবে এক্ষেত্রে গৌরবের সিংহভাগ প্রথম কনিষ্কের প্রাপ্য। তাঁর সঙ্গে যে নামটি বিশেষভাবে জড়িত, তিনি হলেন একাধারে কবি, নাট্যকার এবং দার্শনিক, অশ্বঘোষ।

সুবর্ণাক্ষীর পুত্র অশ্বঘোষ সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। কনিষ্ক তাঁকে পাটলিপুত্র থেকে নিয়ে যান। পুণ্যায়নের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

এর পর তিনি তাঁর সমগ্র কাব্য ও নাট্যপ্রতিভা বৌদ্ধধর্মের সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত *বুদ্ধচরিত*। এ ছাড়া *সৌন্দনন্দ* (সুন্দরী ও নন্দ), ও *সারিপুত্রপ্রকরণ*-ও তাঁর রচনা। অনেকে চৈনিক অনুবাদ এবং ধর্মকীর্ত্তি ও জয়ন্ত ভট্টের রচনায় দুইবার উল্লেখের উপর নির্ভর করে মনে করেন যে, গৌতম বুদ্ধের কাছে রাষ্ট্রপালের ধর্মান্তর গ্রহণ বিষয়ক গীতিনাট্য (রাষ্ট্রপাল নাটক) তাঁর রচনা। এই গ্রন্থে দুঃখ, শূন্যতা, আনাত্মা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে। তাই অনেকে তাঁকে একটি নতুন দর্শনের প্রবর্তক বলে মনে করেন। এই দর্শন তথ্যতা দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শনের মূল কথা হল চমর সত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না, তাকে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, অথবা স্বজ্ঞার দ্বারা জানতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর *বজ্রসূচী* গ্রন্থটির কথাও বলা যায়। এখানে তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্মতভাবে, অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও দাবিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, অশ্বঘোষ শুধু সাহিত্যেই নয়, ধর্ম ও দর্শনেও নতুন ভাবধারায় প্রবর্তন করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম প্রখ্যাত নাম অশ্বঘোষ। বুদ্ধের জীবন অবলম্বন করে তাঁর কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনব বলা যায়। কেননা তাঁর আগে সংস্কৃত সাহিত্যে কোন নাটক ছিল বলে মনে হয় না। তিনিই এই সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। তাঁর রচনায় মহিলা, সাধারণ ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত (যদিও তা সর্বদা পাণিনি অনুমোদিত নয়) কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। অবশ্য তাঁদের বাচনভঙ্গী এবং প্রণয়রীতি রাজসভার আড়ষ্টতামুক্ত নয়।

চৈনিক এবং তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে সমগ্র বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থে অতি সরলভাবে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। ঘটনার নির্বাচনে ও বিন্যাসে অশ্বঘোষ তাঁর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রণয় দৃশ্যের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। মানুষের সাধারণ দুঃখকে কীভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করতে হয়, তা তিনি ভালভাবে জানতেন। বার্ধক্য, মৃত্যুজনিত দুঃখের জীবন্ত চিত্র তিনি *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থে এঁকেছেন। বুদ্ধের কাছে তাঁর জ্ঞাতিভাই নন্দের ধর্মান্তর গ্রহণ, আঠারোটি পর্বে বিভক্ত, সৌন্দরানন্দ-এর বিষয়বস্তু। অশ্বঘোষ নিজেই বলেছেন যে, শান্তি ও মুক্তির জন্য তিনি এই গ্রন্থটি লিখেছেন। এতে একদিকে স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি নন্দের প্রেম, অন্যদিকে বুদ্ধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগ ক্লিষ্ট নন্দর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনে হয় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অন্য শিল্পীদের অন্যতর শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। কেননা এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত একটি অনুপম প্রাচীর-চিত্র অজন্তায় পাওয়া গেছে। সারিপুত্র মৌদগল্লায়নের ধর্মান্তর গ্রহণ *সারিপুত্র প্রকরণ* নাটকটির উপজীব্য। এই নাটকের অংশবিশেষ মধ্য-এশিয়ার তুরফানে পাওয়া গেছে। নয়টি অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটি সমগ্রভাবে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে-বর্ণিত প্রকরণ অনুসারে লিখিত। বলা যায় এই নাটকটি রচনা করে তিনি নাটক রচনার একটি মান নির্দিষ্ট করে দেন। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে এটিই প্রচীনতম। অশ্বঘোষের রচনা প্রাচীন ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ই-সিং যখন সপ্তম খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন, তখন তিনি দেখেন যে, এখানকার মানুষ তাঁর রচনা বারংবার আবৃত্তি করেও ক্লান্ত হত না।

কুষাণযুগের অপর একটি রচনা সূত্রালঙ্কার মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গেছে। এটি একটি সংস্কৃত উপাখ্যানের সঙ্কলন। চৈনিক উপাদানে এই গ্রন্থটির সঙ্গে অশ্বঘোষের নাম যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটি হয়তো প্রকৃতপক্ষে

তাঁর কনিষ্ঠ সমকালীন কুমারলাটের সৃষ্টি। ইনি ছিলেন তক্ষশিলার অধিবাসী। অশ্বঘোষ তাঁকে প্রভাবিত করেন। অশ্বঘোষের অপর একজন সমসাময়িক, কনিষ্কের রাজসভা কর্তৃক আদৃত কবি ছিলেন মাতৃচেত। তাঁর *বৌদ্ধ স্তোত্র* মধ্য-এশিয়া এবং তিব্বত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ই-সিং-এর সময় এগুলিও খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই সময় কাব্যরীতিতে লিখিত বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দের *অবদানশতক* এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের *দিব্যদান*-এর কথা বলা যায়।

তৎকালীন বৌদ্ধ লেখকদের মধ্যে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন নাগার্জুন। অশ্বঘোষের মতো তিনিও জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর চিন্তায় তাই বেদান্তের প্রভাব অনস্বীকার্য। চৈনিক এবং তিব্বতী ভাষায় রচিত তাঁর জীবনকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিনি কাঞ্চি অথবা বিদর্ভের উপকণ্ঠে বাস করতেন। অনেকে মনে করেন যে, কুষাণদের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না। চৈনিক উপাদানে কনিষ্ক প্রসঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়নি। গুন্টুর জেলার অন্তর্গত নাগার্জুনিকোন্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দেখে মনে হয় যে, দক্ষিণের সাতবাহন রাজ্য তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। হালের *গাথাসপ্তশতিতে* এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সাতবাহন বন্ধুকে লেখা নাগার্জুনের চিঠি তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত আছে। বাণভট্টও নাগার্জুনকে সাতবাহনের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক। তিনি একদিকে সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের একান্ত বাস্তবতা এবং অন্যদিকে যোগাচার বৌদ্ধদের চরম আদর্শবাদের মধ্যে মধ্যপথের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর প্রধান অকুতোভয় স্বকৃত টীকাসহ *মাধ্যমিক-কারিকা*। তাঁর মতে কোন বস্তুই সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত বা অনুপস্থিত নয়। তিনি 'সমবৃত্তি সত্য' অর্থাৎ বস্তুর আপেক্ষিক সত্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সুদীর্ঘকালব্যাপী দেহান্তর গ্রহণের, অর্থাৎ সংসারের, প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং পরিবর্তনশীল জগৎ যদি অবাস্তব হয়, তাহলে এর বিপরীত নির্বাণও অবাস্তব। সুতরাং সংসার ও নির্বাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একমাত্র বস্তু যার অস্তিত্ব আছে, তার কোন উদ্দেশ্যের গুণ বা ধর্ম, অর্থাৎ বিধেয় থাকতে পারে না। তিনি একে শূন্যতা বলেছেন। তাঁর মতবাদকে তাই শূন্যতাবাদ বলা হয়।

নাগার্জুন শুধুমাত্র একজন বড় দার্শনিক ছিলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। তাঁকে রসায়ন ও অপরসায়ন-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা মনে করা হয়। একথা বলা চলে যে তাঁর মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু রচিত হয়েছিল।

ভেষজবিজ্ঞানের এ যুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চরক ও শুশ্রুতের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই ঠিক কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, বলা যায় না। ঐতিহ্য অনুসারে চরক কনিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। বাসাম তাঁকে প্রথম খ্রিস্টাব্দে স্থান দিয়েছেন। আবার অনেকের মতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। শুশ্রুতের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আরও তীব্র। কারও মতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মানুষ। আবার অনেকের মতে তিনি ছিলেন চতুর্থ খ্রিস্টপূর্ব। অনেকে *চরক-সংহিতা* গ্রন্থটি চরকের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত মনে হয়। কেননা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির রচনায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। চরকের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। নবম শতাব্দীর দৃঢ়বল নামক জনৈক কাশ্মীরী কর্তৃক পরিবর্তিত সংস্করণ পাওয়া গেছে। তিনি চরকের গ্রন্থের সঙ্গে কয়েকটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছিলেন। এই গ্রন্থে আটটি প্রধান ব্যাধি ও তাদের প্রতিকারের কথা আছে। পরবর্তীকালে আরবী ও পার্সী ভাষায় বইটি অনূদিত

হয়েছিল। এ থেকে এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। শুশ্রুতের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। চন্দ্রক কর্তৃক পরিবর্তিত একটি সংস্করণ পাওয়া গেছে। এই বইতে অস্ত্রোপচারের অস্ত্র ও বিধান সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রাচীন যুগে কুষাণগণ যে নিজস্ব ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগে মানুষের যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বেড়েছিল এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়েছিল। তাই ভৌগোলিক ও জাতিগত দিক থেকে নিঃসম্পর্ক মানুষ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। একদিকে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং অন্যদিকে কুষাণসম্রাটদের সৎকাব্য এবং শ্রীর মধ্যে বিরোধ মেটানোর সক্রিয় প্রয়াসের ফলে কুষাণযুগ প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি ফলবান অধ্যায় হতে পেরেছিল।

৪ক.৫ সাতবাহনগণ

মৌর্যগণ নানাভাবে ভারতের ঐক্যকে অগ্রসর করেছিলেন। তাঁরা ভারতের বৃহত্তর অংশ তাঁদের ছত্রছায়াতলে এনেছিলেন, আলেকজান্ডারের সেনাপতিগণ এবং সেলুকাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করেছিলেন, সমগ্র সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একটি ভাষা ও ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষাটি ছিল প্রাকৃত এবং অশোকের সময় থেকে সেই ধর্ম ছিল, বৌদ্ধধর্ম।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের এই ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রকে কেন্দ্র করে সাতবাহন বংশ একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। শক্তি গৌরবের দিক থেকে এই সাম্রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

এ যুগের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। প্রশ্নটি হল, মৌর্যসাম্রাজ্যের ভাঙনের পর উত্তর-ভারত, সিন্ধু এবং বঙ্গদেশ বাদে গঙ্গা উপত্যকা, বিদেশীরা আক্রমণ এবং অধিকার করেছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারত প্রধানত স্থানীয় শাসকের অধীনেই থেকে গেল। ভারতের দুইটি অঞ্চলে এই পার্থক্য কেন ঘটল? এর মূল কারণ হয়তো এই যে, লাঙলব্যবহারকারী গ্রাম উত্তর ভারতের অর্থনীতিকে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, অর্থাৎ নর্মদার দক্ষিণে, এই ধরনের অসংখ্য নিষ্ক্রিয় গ্রাম তখনও গড়ে ওঠেনি। সেখানে অনেক উন্নত সঙ্ঘ (গিল্ড) ছিল এবং অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে ব্যবসায়ে লাভও নেহাৎ কম হত না। দাক্ষিণাত্যে কৃষির বিকাশ বোধহয় মৌর্য-পরবর্তী যুগের ঘটনা। দাক্ষিণাত্য, জুনাগড় বাঁধের মতো কোন বৃহৎ জলাধারের কথা জানা যায় না। উত্তর ভারতে সমভূমিতে খাদ্যসংগ্রহকারী এবং খাদ্যউৎপাদনকারী, উভয়ের জন্য যথেষ্ট স্থান ছিলনা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ঘন অরণ্যে ব্যাপক কৃষিকার্য অসম্ভব ছিল। দাক্ষিণাত্যে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে কৃষি এবং কৃষকদের বসতিস্থাপন প্রকৃতপক্ষে মৌর্যদের পরে শুরু হয়েছিল। সেখানে পর্বত অরণ্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন বসতিবিরল সঙ্কীর্ণ বাণিজ্যপথই শুধু মৌর্যদের অধিকারে ছিল। মহীশূরের দক্ষিণে কোন অঞ্চল জয়ের চেষ্টা মৌর্যরা করেনি। দাক্ষিণাত্যে কৃষি মৌর্যদের পরে এসেছিল। তার অর্থ এ নয় যে, সাতবাহন সেখানে লাঙলের আমদানি করেছিলেন। বরং বলা যায় যে সাতবাহনবংশ যে ধরনের রাজত্ব স্থাপন করেছিল, লাঙলের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল।

অনেকে বলেছেন যে, পশ্চিম এবং উত্তর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি ছিল উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে 'সেতুরাজ্য'। তাদের এই অবস্থিতি, একদিক দিয়ে তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেননা এর ফলে তারা যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সাতবাহন রাজ্যের উত্থান এমন সময়ে হয়েছিল, যখন উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সাতবাহন রাজ্যকে তাই উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে দ্রব্য ও ভাব বিনিময়ের প্রথম বাহন হতে হয়েছিল।

মৌর্য-পরবর্তী এবং গুপ্ত-পরবর্তীযুগের ইতিহাস প্রধানত সাতবাহন এবং কুষাণগণের দ্বারা চিহ্নিত। সাতবাগনগণ দক্ষিণ ভারতে এবং কুষাণগণ উত্তর ভারতে, মৌর্য-পরবর্তী বিক্ষুব্ধ যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। এই অন্ধকার মধ্যবর্তী সময়ে উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন তারাই রেখেছিল।

মৌর্যদের পর বিন্ধ্য-পরবর্তী অঞ্চলে দুইটি শক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। একটি কলিঙ্গের চেদি অথবা চেতবংশ, অন্যটি উত্তর দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশ। চেদিবংশের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু সাতবাহন বংশের হয়েছিল।

৪ক.৫.১ কালসীমা

সাতবাহনবংশ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পুরাণে এই বংশের রাজাদের সংখ্যা এবং তাঁদের মিলিত রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐক্যমত্য নেই। কোন কোন পুরাণে এই সংখ্যা দেওয়া উনিশ, আবার কোন কোন পুরাণে ত্রিশ। এই বংশের রাজত্বকালে কোথাও আছে তিনশো বছর, আবার কোথাও বা সাড়ে চারশো বছর। বায়ুপুরাণ-এ এই শাসনের মেয়াদ হয়েছে তিনশো বছর এবং চারশো এগারো বছর, দুই-ই। তাই অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সাতবাহনবংশের প্রধান শাখার শাসক-সংখ্যা ছিল উনিশ এবং তাঁরা তিন শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন, তবে এই বংশের বিভিন্ন শাখার সংখ্যা ছিল ত্রিশ এবং তাঁরা চার শতাব্দীরও অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন।

৪ক.৫.২ সিমুক

সিমুক সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাণ অনুসারে তিনি কণ্ববংশীয় সুসর্মণ এবং শুঙ্গ ভগ্নাংশের ধ্বংসসাধন করে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কণ্ব এবং শুঙ্গদের কাছ থেকে তিনি যে অঞ্চল অধিকার করে, বিদিশার চারিদিকের অঞ্চল হয়তো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাণে কোন কোন স্থানে সিমুকের কণ্বদের ভৃত্য বলা হয়েছে। সুতরাং মনে হয় যে, তিনি পূর্বে কণ্বদের অধীনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন। তিনি তেইশ বৎসর রাজত্ব করেন। জৈন বিবরণ অনুসারে রাজত্বের শেষ দিকে তিনি এমন দুষ্কৃতকারী হয়ে ওঠেন, যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত এবং হত্যা করা হয়।

৪ক.৫.৩ কৃষ্ণ

সিকুকের পরে কণ্হ অথবা কৃষ্ণ রাজা হন। তিনি আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যসীমা পশ্চিমে অন্তত নাসিক পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকালে নাসিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (শ্রমণ মহামাত্র) একটি গুহা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

৪ক.৫.৪ প্রথম সাতকর্ণি

কণ্হ বা কৃষ্ণের পরে প্রথম সাতকর্ণি রাজা হন। পুরাণ অনুসারে তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মনে করেন যে, প্রথম সাতকর্ণি সিমুকের পুত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে ডঃ সরকার মন্তব্য করেছেন যে শাস্ত্রী হয়তো নানাঘাটের ভাস্কর মূর্তির উপর নির্ভর করে এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। এই মূর্তিগুলির গাত্রে পরিচয় সম্বলিত যে লেখগুলি আছে, তাতে কৃষ্ণের নাম নেই। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই লেখগুলি নিশ্ছিদ্র নয়। কেননা মোট আটটি লেখর মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ ভগ্ন। এমনও হতে পারে যে ভগ্ন লেখ দুইটির একটিতে কৃষ্ণের নাম ছিল।

প্রথম সাতকর্ণির জন্য ঐতিহাসিক উপাদান কম নয়। পুরাণ ছাড়াও ভারতীয় সাহিত্যে সাতকর্ণি প্রতিষ্ঠানপতি এবং শক্তিকুমারের পিতারূপে পরিচিত। *পেরিপ্লাস* গ্রন্থের বড় স্যারগানাস প্রথম সাতকর্ণির বিকৃত নামান্তর মাত্র। সাতবাহন রাজাদের মধ্যে একাধিক সাতকর্ণি ছিলেন। তাই পেরিপ্লাস-এর লেখক স্বাভাবিকভাবেই প্রথম সাতকর্ণিকে 'বড়' আখ্যা দিয়েছেন। অন্য সাতকর্ণিগণ কখনও ভৌগোলিক পরিচয় (যেমন কুন্তল সাতকর্ণি) কখনও বা মাতৃপরিচয় (যেমন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি)। দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। শিরি সত নামাঙ্কিত মুদ্রা যে প্রথম সাতকর্ণির, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাণী নাগনিকার নানাঘাট-লেখ সম্পর্কেও সেই একই কথা। হাথিগুম্ফা-লেখতে যে সাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি প্রথম সাতকর্ণি কিনা, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কেননা পুরাণে কৃষ্ণের পরবর্তী সাতকর্ণিকে কণ্বদেব পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। মহাপদ্মনন্দের তিনশত বৎসর পরের খারবেল যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর, সেকথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং খারবেল এবং প্রথম সাতকর্ণি সমসাময়িক ছিলেন, মনে করার কোন বাধা নেই। সাঁচি-লেখর "রাজন শ্রী সাতকর্ণি" প্রথম সাতকর্ণি কিনা এ বিষয়ে মার্শাল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর মতে প্রথম সাতকর্ণি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ এবং এই শতাব্দীতে পূর্ব মালব অন্ধ্রদের অধিকারে ছিল না, শুঙ্গদের অধিকারে ছিল। কিন্তু প্রথম সাতকর্ণি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন, একথা মনে রাখলে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকে না।

প্রথম সাতকর্ণি ক্ষুদ্র সাতবাহন রাজ্যকে বৃহৎ আয়তন দান করেন। সাতবাহনদের দলিলসমূহের মধ্যে প্রথম নানাঘাট-লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি শক্তিশালী অঙ্গির পরিবারের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং 'দক্ষিণাপথপতি'-রূপে পরিচিত হন। এইভাবে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের না হলেও, উত্তর দাক্ষিণাত্যের অধিকার লাভ করেন। এই লেখতে তাঁর সম্পর্কে 'অপ্রতিহত চক্র' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রাজ্যজয় প্রতিহত হয়নি এমন দাবি করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, গোদাবরী উপত্যকা জয় করে তিনি 'দক্ষিণাপথপতি' অভিধা লাভ করেন। হাথিগুম্ফা-লেখ থেকে 'পশ্চিমের অধিপতি' প্রথম সাতকর্ণির সঙ্গে কলিঙ্গারাজ খারবেলের সম্পর্কের কথা জানা যায়। (শাস্ত্রী এই লেখতে উল্লিখিত সাতকর্ণি যে প্রথম সাতকর্ণি হতে পারেন সেই সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি, তবে তাঁর মতে এই সাতকর্ণি দ্বিতীয় সাতকর্ণি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।) হাথিগুম্ফা-লেখর যে অংশে সাতকর্ণির উল্লেখ আছে, সেই অংশের পাঠান্তর থাকায় তাঁর সঙ্গে খারবেলের প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। একটি পাঠ অনুসারে খারবেল তাঁকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছিলেন, অন্য পাঠ অনুসারে খারবেল তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। তবে এই লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রথম সাতকর্ণির

রাজ্যের পূর্বসীমা কলিঙ্গ রাজ্যের পশ্চিমসীমা স্পর্শ করেছিল। প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যজয় তাঁকে নর্মদা নদীর উত্তরে পূর্ব মালবে নিয়ে এসেছিল। এই অঞ্চলে তখন শক এবং যবন আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। পূর্ব মালবে সাঁচি-লেখর উপর নির্ভর করে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, সাঁচি অঞ্চল প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে উৎসর্গীকৃত এই সাঁচিলেখতে প্রথম সাতকর্ণির কারিগরদের মধ্যে প্রধান, আনন্দ কর্তৃক একটি দানের উল্লেখ আছে। ডঃ সরকার মনে করেন যে, এই তথ্যের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেননা, আনন্দ ব্যক্তিগতভাবে এবং তীর্থযাত্রীরূপে সাঁচি মঠে গিয়েছিলেন, এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। তবুও ডঃ সরকার মনে করেন যে, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ সহ উত্তর দাক্ষিণাত্য প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া উত্তর কঙ্কন এবং কাথিয়াবাড় তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন ছিল মনে হয়।

প্রথম সাতকর্ণি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। শাস্ত্রী মনে করেন যে, উত্তরভারতে শুঙ্গ সাম্রাজ্যশক্তিকে পরাজিত করে বিজয়োৎসব হিসেবে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পুরাণে তাঁর এই মতের সমর্থন মেলে। সেখানে আছে যে সাতকর্ণি শুঙ্গ-কণ্বদের অবশিষ্ট শক্তি চূর্ণ করেন। একাধিক কারণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে এতে যেমন তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব সূচিত করে, তেমনই অন্যদিকে তিনি যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাও প্রমাণিত করে।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, প্রথম সাতকর্ণি সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক, যিনি বিন্ধ্য-পরবর্তী অঞ্চলে এই শক্তিকে সার্বভৌম অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে গোদাবরী উপত্যকায় প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে, যা আয়তনে এবং শক্তিতে, গাঙ্গেয় উপত্যকার শুঙ্গ সাম্রাজ্যের এবং পাঞ্জাবে গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। তাঁর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈথান।

প্রথম সাতকর্ণির মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী অন্তিয় বংশীয়া নাগনিকা (অথবা নায়নিকা) দুই নাবালক পুত্র বেদশ্রী এবং শক্তিশ্রীর (সাহিত্যের শক্তিকুমার) হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সাতবাহন বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন দ্বিতীয় সাতকর্ণি।

৪ক.৫.৫ দ্বিতীয় সাতকর্ণি

দ্বিতীয় সাতকর্ণি দীর্ঘ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। কারও কারও মতে তিনি শুঙ্গদের কাছ থেকে মালব ছিনিয়ে নেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন *পেরিপ্লাস* বর্ণিত সানডারেস। তাঁর সময়েই সাতবাহনদের কল্যাণ বন্দর আর নিরাপদ ছিল না। *পেরিপ্লাস* থেকে জানা যায় যে কল্যাণগামী গ্রীক বাণিজ্য পোতকে সতর্ক প্রহরায় নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত বারিগাজায় (ভৃগুকচ্ছ, আধুনিক ব্রোচ) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। *পেরিপ্লাস*-এ বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় মনে হয় শক-ক্ষত্রপ নহপাণের অপরন্ত (উত্তর কঙ্কন) জয়ের ফলে তা সৃষ্ট হয়েছিল।

পৌরাণিক তালিকায় প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির মধ্যবর্তী অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে সাতবাহন বংশের ভিন্ন শাখার মানুষ ছিলেন বলে মনে হয়। অন্য উপাদান থেকে মাত্র তিন জন শাসকের, আপিলক, কুন্তল সাতকর্ণি এবং হালের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় এঁরা কেউই মূল সাতবাহন পরিবারভুক্ত ছিলেন না। আপিলক বোধহয় মধ্যপ্রদেশের কোন একটি শাখার মানুষ ছিলেন। অপর দুই জন ছিলেন কুন্তলের। হালের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি প্রাকৃত ভাষায় বিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষ,

প্রধানত যৌন প্রেম বিষয়ক *গাথাসপ্তশতি* গ্রন্থের সঙ্কলক। সৌন্দর্য এবং লালিত্য এই গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে গ্রামীণ দৃশ্যাবলী এবং প্রাকৃত জনের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভাব্য ঐতিহ্য অনুসারে গুণাধ্যর *বৃহৎকথা* গ্রন্থটিও হালের রাজসভার জন্য লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থটি গ্রামীণ ভাষায় (পৈশাচীতে) রচিত। সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* এই গ্রন্থের সংস্কৃত-রূপায়ণ।

সময়ের দিক থেকে প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্রের মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। এই সময় সাতবাহনগণ ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূল থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব উপকূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম সাতকর্ণি যাদের ভয় করতেন, সেই শকরাই সাতবাহনদের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এই শকরা পূর্ব ইরান থেকে এসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। শক-ক্ষত্রপ নহপাণের অনেকগুলি মুদ্রা নাসিক অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। অনেকে বলেন যে, সাতবাহনের এই আপাত বিপর্যয়ের ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র অঞ্চলে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। তাই পরে তারা যখন পশ্চিম উপকূলে ফিরে এসেছিল, তখন তাদের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের অর্ধাংশ, এক উপকূল থেকে আর এক উপকূল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল।

৪ক.৫.৬ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি

গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি নিঃসন্দেহে সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে দুইটি লেখ আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। একটি তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বৎসরে রচিত। এটি নাসিক লেখ নামে পরিচিত। অন্যটি চতুর্বিংশ বৎসরে মা গৌতমী বলশ্রীর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখ নাসিক প্রশস্তি। গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর উনিশ বৎসর পরে তাঁর মা এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। সাতবাহন বংশের দুর্দিনে পুত্রহারা মা এখানে তাঁর পুত্রের অতীত কীর্তি কাহিনী স্মরণ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লেখর সংখ্যা খুব বেশি নয়। খারবেলের হাতিগুম্ফা-লেখ, রুদ্রদামনের জুনাগড়-লেখ, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লেখর সঙ্গে এটি তুলনীয়।

কয়েকটি সূত্র থেকে গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সম্ভব। প্রথমত তিনি নহপাণের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন। এই ঘটনাটি খ্রিঃ ১২৪-১২৫ অব্দে ঘটেছিল মনে হয়। কেননা তার পরে নহপাণের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরও মনে হয় যে গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে তিনি নহপাণকে পরাজিত করেছিলেন। কেননা এই বৎসরে রচিত নাসিক-লেখতে আছে যে, গৌতমীপুত্র নহপাণের জামাতা, নাসিক ও পুনা অঞ্চলের শাসক ঋষভদত্তের অধিকারভুক্ত জমি অন্যকে দান করেছিলেন। আরও জানা যায় যে, সাতবাহন সেনাবাহিনী যখন জয়লাভে তৎপর, তখন একটি সামরিক ছাউনি থেকে এই দানপত্রটি প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৌতমীপুত্র নিজে তখন নাসিক অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এইসব ঘটনা যে নহপাণের সঙ্গে তাঁর শেষ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। খ্রিঃ ১২৪-২৫ অব্দ যদি গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসর হয়, তাহলে খ্রিঃ ১০৬ অব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তাঁর শেষ লেখটি রাজত্বকালের চতুর্বিংশ বৎসরে রচিত হয়েছিল। মনে হয় তখন তিনি

পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন কেননা এই লেখটি গৌতম বলশ্রীর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত হয়েছিল। এর পরে তিনি আর বেশিদিন বাঁচেন নি। সুতরাং তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিঃ ১০৬-১৩০ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন যে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির ২৪ বৎসরের রাজত্বকালের বেশিরভাগ ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে। তবে এমনও হতে পারে যে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে রাজত্ব করেন এবং গৌতমীপুত্র নহপপাণের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহন বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'সাতবাহন-কুল-যশঃ-প্রতিষ্ঠাপনকর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হলেও, একমাত্র কৃতিত্ব নয়। নাসিক প্রশস্তিতে তিনি যে অঞ্চলগুলি শাসন করতেন, তাদের নামের বিস্তৃত তালিকা আছে। এই নামগুলি হল ঃ আসিক (মহারাষ্ট্র), মলক (পৈথানের পার্শ্ববর্তী), সুরথ (কাথিয়াবাড়), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়), অনুপ (নর্মদাতীরে মাহিশ্মতী), বিদর্ভ (বেরার), আকর (পূর্ব মালব) এবং অবন্তী (পশ্চিম মালব)। এ ছাড়া এই প্রশস্তিতে তাঁকে বিন্ধ্য পর্বত থেকে মলয় পর্বত (ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়) পর্যন্ত এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি বলা হয়েছে। এ থেকে ডঃ সরকার মনে করেন যে, তিনি বিন্ধ্য-পরবর্তী সমগ্র ভূভাগের উপর তাঁর সার্বভৌমত্য দাবি করতেন। তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে প্রচারিত নাসিক লেখতে কানাড়া অঞ্চলে বেজয়ন্তী অন্তর্ভুক্তির বিশেষ উল্লেখ আছে।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, এই তালিকায় দুইটি প্রত্যাশিত নাম নেই। নাম দুটি হল অন্ধ্র এবং দক্ষিণ কোশল। লেখ এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই দুটি অঞ্চল কোন-না-কোন সময় সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির পুত্র পুলুমায়ি প্রথম সাতবাহন শাসক, যাঁর লেখ এখানে পাওয়া গেছে। গৌতমীপুত্র দাবি করেছেন যে তাঁর সৈন্যদল তিনটি সমুদ্রের (আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর) জল পান করেছিলেন (তি-সমুদ্র-তোয়-পীত বাহন)। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, এই দাবির মধ্যে তাঁর এই অঞ্চলের উপর আধিপত্যের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডঃ কে. গোপালাচারি বলেছেন যে, গৌতমীপুত্রের অধিকৃত স্থানসমূহের মধ্যে মহেন্দ্র (মহানদী এবং গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালা) এবং চকোরের (পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণভাগ) উল্লেখ আছে। এ থেকে কলিঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ যে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে 'শক-যমন-পল্লব-নিসূদন' অর্থাৎ ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। পল্লবগণ ছিল পার্থিয় এবং যবনগণ, গ্রীক। তাদের সঙ্গে গৌতমীপুত্রের সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। শকদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের রেখাচিত্র শকদের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। জোগালথেম্বিতে প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে এই সংগ্রামের পরিণতির কথা জানা যায়। সেখানে নহপাণের যে অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে, দেখা যায় যে, তার দুই-তৃতীয়াংশ গৌতমীপুত্র কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, নহপাণ গৌতমীপুত্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। ডঃ গোপালাচারি মন্তব্য করেছেন যে, গৌতমীপুত্রের এই সাফল্য সাতবাহনদের উচ্চাশাকে অতিক্রম করেছিল। নাসিক লেখতে যে স্থানগুলির উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে অপরান্ত, অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, আকর এবং অবন্তী, এই জয়ের ফলে গৌতমীপুত্র লাভ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে এর দ্বারা উত্তর দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অংশবিশেষ বিদেশী শাসনমুক্ত হয়েছিল।

এই জয়লাভকে চিহ্নিত করার জন্য গৌতমীপুত্র গোবর্ধন জেলায় (নাসিক) বেনাক টক নগর নির্মাণ করেন এবং শকদের অনুকরণে আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা (রাজরাজ এবং মহারাজ) গ্রহণ করেন।

গৌতমীপুত্রের এই জয়লাভ স্থায়ী হয়নি। শকদের অন্যতম শাখা, ক্ষহরত শাখার নহপাণকে তিনি পরাজিত করেন, কিন্তু অপর একটি শাখা, কার্দমক শাখা তাকে পরাজিত করে। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা চষ্টন গৌতমীপুত্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর পৌত্র রুদ্রদামন খ্রিঃ ১৩০ অব্দে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য শুরু করেন। তার আগে তিনি চষ্টনের সহকর্মীরূপে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত হন। মনে হয় এই অবস্থায় তিনি গৌতমীপুত্রকে পরাজিত করেছিলেন। রুদ্রদামনের এই জয়লাভের প্রমাণ টলেমির গ্রন্থে এবং জুনাগড় লেখতে পাওয়া যায়। টলেমি প্রতিষ্ঠানকে (পৈথান) পুলুমায়ির রাজধানী এবং উজ্জয়িনীকে চষ্টনের রাজধানী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে চষ্টনের শাসনকালে মালব কার্দমক শকগণের অধিকারে ছিল এবং তাঁর পৈতৃক সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের উপর পুলুমায়ির কোন অধিকার ছিল না। খ্রিঃ ১৫০ অব্দে জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামনের অধিকারভুক্ত স্থানগুলির উল্লেখ আছে। এই স্থানসমূহের মধ্যে আকর, অবন্তী, অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত ইত্যাদির নাম নাসিক-প্রশস্তিতেও ছিল। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, এই স্থানগুলি তিনি সাতবাহনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং সাতবাহনশাসক তখন গৌতমীপুত্র ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন না। এই সমূহ বিপদের সময় গৌতমপুত্র তাঁর অধিকৃত কিছু অঞ্চল রক্ষা করার জন্য তাঁর অন্যতম পুত্র, বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির (খুব সম্ভব পুলুমায়ির সৎ ভাই) সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কানহেরি (অপরান্তে) লেখতে এই বিবাহ সম্পর্কে আভাস আছে। এই বিবাহ গৌতমীপুত্রের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। অনেকে কিন্তু এই বিবাহ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, বর্ণসঙ্করের বিরোধী সাতবাহনদের শক পরিবারের সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা। এ থেকে বোঝা যায় যে তখন জাতিভেদ ব্যবস্থা সম্পর্কে কথায় ও কাজে বিশেষ মিল ছিল না। অবশ্য এই বিবাহ প্রকৃতপক্ষে সাতবাহনের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছিল কিনা সন্দেহ। কেননা, জুনাগড় লেখতে আছে যে, রুদ্রদামন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু কুটুম্ব বলে তাঁর রাজ্য গ্রাস করেন নি। এই সাতকর্ণি কে ছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, এই সাতকর্ণি নিশ্চয়ই গৌতমীপুত্র কেননা বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি রুদ্রদামনের জামাতা ছিলেন। অন্য মতে, তিনি জামাতার ভাই-ও হতে পারেন। র‍্যাপসন মনে করেন যে, এই পরাজিত সাতবাহন নৃপতি ছিলেন পুলুমায়ি।

ডঃ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, গৌতমীপুত্রের পরবর্তী বিপর্যয় সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়। এই মত দুইটি ধারণার উপর নির্ভরশীল। একটি ধারণা এই যে, রুদ্রদামন যে সাতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করেন, তিনি গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি। দ্বিতীয়ত, রুদ্রদামন এবং চষ্টনের অন্ধাউ লেখ রচনাকালে অর্থাৎ ১৩০ খ্রিস্টাব্দে শকগণ সাতবাহন রাজ্যের বৃহৎ অংশ জয় করেছিলেন। এর উত্তরে ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, কানহেরি লেখ অনুসারে বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির মহিষী মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যা ছিলেন। সুতরাং পুলুমায়ির পরবর্তী শাসক বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি রুদ্রদামনের আত্মীয় ছিলেন এবং স্পষ্টত তিনি অর্থাৎ বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি পরাজিত হয়েছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি হননি, কেননা

তাঁর রাজত্ব ১৩০ খ্রিস্টাব্দের আগেই শেষ হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে পুলুমায়ি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করেন এবং সম্ভবত, তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসক ছিলেন বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি। দ্বিতীয়ত, ১৩০ খ্রিস্টাব্দের অন্ধাউ লেখ থেকে জানা যায় যে, শুধুমাত্র অন্ধাউ (কচ্ছ) অঞ্চলের উপর চষ্টন গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সাতবাহন রাজ্যের বৃহৎ অংশের উপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১১ বৎসরে, অর্থাৎ ৮৯ (১১+৭৮) খ্রিস্টাব্দ থেকে অন্ধাউ চষ্টনের অধিকারে ছিল। এই অঞ্চল একদা গৌতমীপুত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং এমন হতে পারে যে, ৮৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি এই অঞ্চল শাসন করতেন। তৃতীয়ত, তিনি বলেন যে, নহপাণের সম্ববৎসরের সঙ্গে শকাব্দের কোন যোগ ছিল না। তাঁর ৪৬ বৎসর, যার সঙ্গে ৭৮ যোগ করে, ১২৪ খ্রিস্টাব্দ তাঁর রাজত্বের শেষ উল্লিখিত তারিখ মনে করা হয়, সেটি হয়তো শুধু তাঁর ৪৬ বৎসর বোঝায়। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায় যে, নহপাণের সঙ্গে কুষাণদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং শকাব্দ অথবা কনিষ্কের অব্দ ব্যবহারের তাঁর কোন কারণ ছিল না।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র শুধু যোদ্ধারূপে চিত্রিত হননি, সংস্কারক রূপেও চিত্রিত হয়েছেন। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, যোদ্ধা হিসাবে তিনি বড় ছিলেন, কিন্তু শান্তির কাজে তিনি ছিলেন আরও বড়। নাসিক প্রশস্তিতে আছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প এবং মান চূর্ণ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ এবং নিম্নতম শ্রেণীর স্বার্থের উন্নতি বিধান করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করেছিলেন। ডঃ গোপালাচারি শেষ বক্তব্যটি পুরোপুরি মেনে নেননি। তিনি বলেছেন যে, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষিত হলেও কর্মভিত্তিক উপ-জাতি গঠন বন্ধ করা যায়নি। গৌতমীপুত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও, বৌদ্ধদের প্রতি অতি উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। কার্লে, নাসিক প্রভৃতি স্থানের বিহারবাসীদের তিনি ভূমি এবং গুহা দান করেছিলেন। অবশ্য তাঁর সব দানই একশ্রেণীর বৌদ্ধদের (মহাসঙ্ঘিকগণ) জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, তাঁর শাসনের ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় বিধান এবং মানবতাবোধ। তাঁর করব্যবস্থায় এই বোধ প্রতিফলিত হয়েছিল।

৪ক.৫.৭ পুলুমায়ি

স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর এবং তাঁর পুত্র, ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, গৌতমীপুত্র এবং পুলুমায়ি যুগ্মভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

পুরাণ অনুসারে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি ২৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ডঃ রায়চৌধুরী কারলে লেখর উল্লেখ করে বলেছেন যে, সেখানে তাঁর রাজত্বকাল ২৪ বৎসর বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতে পুলুমায়ির রাজত্বকাল খ্রিঃ ১৩০-১৫৪ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করেন।

সাতবাহনদের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লেখতে পুলুমায়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনিই এই বংশের প্রথম রাজা যাঁর লেখ পূর্ব দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গেছে। তাঁর লেখগুলি নাসিক, কারলে (পুণা) এবং অমরাবতীতে (কৃষ্ণা জেলা) পাওয়া গেছে। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের উপর তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু অমরাবতীতে প্রাপ্ত লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্যন্ত সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত করে তিনি এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করেছিলেন। সমগ্র কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল এবং মহারাষ্ট্র তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেলারি জেলার একটি তালুকেশ্রী পুলুমায়ির একটি লেখ পাওয়া গেছে। তাই কারও কারও মতে তিনি বেলারি জেলা অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী এই লেখতে পুলুমায়ির নামের সঙ্গে 'বাশিষ্ঠীপুত্র' কথাটি না থাকায়,

তিনি প্রকৃতপক্ষে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। করমণ্ডল উপকূলে পুলুমায়ির কয়েকটি মুদ্রায় দ্বিমাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজের চিত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণে এই উপকূলেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, লেখর সমর্থন না থাকায়, শুধুমাত্র মুদ্রায় উপর নির্ভর করে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে এই মুদ্রা নিঃসন্দেহে তৎকালীন নৌবহর এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের আভাস দেয়। তাহলে বলা যায় যে গৌতমীপুত্র এবং বাশিষ্ঠীপুত্রের সময় দাক্ষিণাত্য, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে শুধু রাজনীতিতে নয়, ব্যবসা এবং ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রকৃত যোগসূত্র হয়ে ওঠে।

তাঁরও রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান। এখানে তিনি নবনগর নির্মাণ করেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপটির আয়তনও তাঁর সময় বাড়ানো হয়।

পুলুমায়ির পর শিবশ্রী এবং পরে শিবস্কন্দ রাজা হন। ডঃ গোপালাচারি লিখেছেন যে, শিবশ্রীর সময় শকদের সঙ্গে সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এর ফলে সাতবাহনগণ অনুপ এবং অপরান্তের উপর তাঁদের অধিকার হারান। শিবস্কন্দ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৪ক.৫.৮ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি

সাতবাহন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিঃ ১৬৫-১৯৪ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে, উভয় দিকে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে নাসিক কানহেরি এবং কৃষ্ণা জেলার চীন-গঞ্জামে তাঁর লেখগুলি পাওয়া গেছে। মাদ্রাজের কৃষ্ণা-গোদাবরী জেলায়, মধ্যপ্রদেশের চন্দ জেলায়, বেরার, উত্তর কঙ্কন, বরোদা এবং কাথিয়াবাড়ে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র শাসন করতেন। শকদের কাছ থেকে তিনি অপরান্ত পুনরুদ্ধার করেন। সোপারায় (প্রাচীন সূর্পরক, অপরান্তের রাজধানী) তাঁর যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি এর অন্যতম প্রমাণ। এই মুদ্রায় শকমুদ্রার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সাতবাহনদের সব মুদ্রার মধ্যে একমাত্র যজ্ঞশ্রীর মুদ্রাতেই রাজার মাথা পাওয়া গেছে। পশ্চিম ভারতের শকদের মুদ্রার এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অপরান্ত ছাড়া যজ্ঞশ্রী শকদের পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ এবং নর্মদা উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেন। রুদ্রদামনের পরে শকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই তাঁর এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। তার মুদ্রায় অঙ্কিত জাহাজের চিত্র থেকে অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রের উপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। সাতবাহন বংশের তিনিই শেষ শাসক, যিনি যুগপৎ পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর পরেই সাতবাহন সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ও পতন ঘটে।

বয়সের ভারে এবং ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য সাতবাহন শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাও একে দুর্বল করেছিল। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির রাজত্বের শেষ দিকে এই দুর্বলতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবিরগণ তখন নাসিক অঞ্চল তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ডঃ গোপালাচারি মাধরিপুত স্বামী সকসেনকে যজ্ঞশ্রীর উত্তরাধিকারীরূপে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী সাতবাহন শাসকদের মধ্যে বিজয়, চন্দ্রশ্রী এবং পুলমায়ির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাতবাহন সাম্রাজ্য পরিণামে কীভাবে ভেঙে পড়েছিল, তার আভাস অকোলায় প্রাপ্ত সাতবাহনদের বহুসংখ্যক মুদ্রা এবং নাগার্জুনিকোণ্ডে প্রাপ্ত ইক্ষাকুবংশের বিভিন্ন লেখ থেকে পাওয়া যায়। মনে হয় পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বংশ এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। সাতবাহনদের একটি শাখা উত্তরাঞ্চল অধিকার করেছিল। পশ্চিমে আভিরগণ নাসিক এলাকা অধিকার করেছিল। পূর্বে, কৃষ্ণা-গুন্টুর অঞ্চলে ইক্ষাকুগণ একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল। চুটুগণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দখল করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার রাজনৈতিক শূন্যতা পল্লবগণের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এইভাবে নন্দ বংশের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তার অবসান হয়েছিল।

৪ক.৫.৯ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা

গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি এবং বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির সরকারি দলিল এবং ব্যক্তিগত বৌদ্ধ নথিপত্র থেকে বৃহৎ সাতবাহন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা জানা যায়। তবে এসবের পরিপূরক অথবা সমর্থকরূপে কোন সাহিত্য গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।

ডঃ গোপালচারি সাতবাহন রাষ্ট্রকে 'পুলিশ রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক রাষ্ট্রের মতো, সাতবাহন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জটিল ছিল না। এটা ছিল সহজ সরল। ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধান এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সাতবাহন রাজারা মাতৃপরিচয় দ্বারা চিহ্নিত হলেও এই রাজতন্ত্র ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং বংশানুক্রমিক। রাজপরিবারে বহু বিবাহের প্রচলন থাকলেও সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিতর্ক, ভ্রাতৃবিরোধ অথবা সাম্রাজ্য বিভাগের কাহিনী সাতবাহনদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেনি। সাতবাহন রাজারা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দো-গ্রীক অথবা কুষাণদের মতো সাম্রাজ্যিক অভিধা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা দৈব অধিকার দাবি করেন নি। তাঁরা সামান্য 'রাজন' অভিধাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেন ছিলেন, তার ব্যাখ্যাও অনেক দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, স্থানীয় নৃপতিদের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ হয়তো এমন ছিল না, যাতে তাঁরা সাম্রাজ্যিক অভিধা নিতে পারতেন। নীতিগতভাবে সাতবাহন রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কার্যত তাঁদের ক্ষমতা দেশাচার এবং শাস্ত্রর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁদের সমাজশৃঙ্খলার রক্ষক মনে করা হত।

রাজা হয় রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগরীতে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতেন। তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়করূপে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলকে নেতৃত্ব দিতেন। অনেক সময় যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করতেন।

রাজপুত্রদের সকলকে 'কুমার' আখ্যা দেওয়া হত। চেত বংশের শাসনে তাদের 'যুবরাজ' বলা হত এবং তাদের দেশশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হত। সাতবাহনদের মধ্যে এই রীতির প্রচলন ছিল না। কিন্তু মৌর্য যুগের মতো তাঁরা প্রদেশ শাসনের কাজে নিযুক্ত হতেন। রাজার মৃত্যুর সময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক হলে, রাণী-মা অথবা মৃত রাজার ভাই দেশশাসন করতেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্ত নৃপতিগণ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সাধারণভাবে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে এঁরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ, তাঁরা 'রাজা' উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করতেন। কোলাপুরে এবং উত্তর কানাড়া অঞ্চলে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এদের পরে স্থান ছিল মহারথীদের এবং মহাভোজদের। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, রথিক এবং ভোজগণ যুদ্ধে সাতবাহনদের সাহায্য করেছিল এবং তারই পুরস্কার হিসেবে এই নামের পদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুইটি

পদবীই বংশানুক্রমিক এবং কয়েকটি স্থান ও পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষভাবে বোম্বাই ও উত্তর মহীশূরের থানা ও কোলাবা জেলায় এদের সাক্ষাৎ মেলে।

ক্রমবর্ধমান সাতবাহন সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য পরবর্তীকালে মহাসেনাপতি এবং মহাতালবর, এই দুইটি সামন্ত পদবীর সৃষ্টি হয়। বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির রাজত্বকালে রচিত নাসিক লেখতে সর্বপ্রথম মহাসেনাপতি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী রাজাদের লেখতে দুইবার এই পদের উল্লেখ আছে। একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা নথিপত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হতেন। শেষ সাতবাহন রাজার সময় জনৈক মহাসেনাপতি জনপদের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে তাঁরা দূরবর্তী প্রদেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত হতেন। আবার অনেকে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁরাও রাজপরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতেন। এইভাবে রাজবংশের প্রতি তাঁদের আনুগত্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হত। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে স্বনামে মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁদের আনুগত্য লাভ সর্বদা সম্ভব হয়নি। সাতবাহন সাম্রাজ্যের ভাঙন পর্বে এই সামরিক শাসনকর্তা এবং সামন্ত নৃপতিগণ নিজ মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অন্ধ্রদেশের সামন্ত পরিবার সালংকায়নগণ পরে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে পল্লবগণ নিঃসন্দেহে বেলারি জেলার সামরিক শাসকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শাসন কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে গামিকর অধীন গাম (গ্রাম)। এই গ্রামই ছিল রাজস্ব এবং সৈন্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। মনে হয় সেই সময় শাসনব্যবস্থায় যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল, তা উপরের স্তরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামগুলিকে তা স্পর্শ করেনি। সাতবাহন যুগের অন্য যে কর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ভাণ্ডারিক (ভাণ্ডার রক্ষক), নিবন্ধকার (দলিল নথিভুক্তকরণ সম্পর্কিত) দূতক এবং হেরাণিক (কোষাধ্যক্ষ) উল্লেখযোগ্য।

সে যুগে সরকারের আর্থিক অবস্থা ছিল দিন আনা দিন খাওয়া গৃহস্থের মতো। করের সংখ্যা পরিমাণ, কোনটাই খুব বেশি ছিল না। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল রাজকীয় জমি, ভূমি-কর, লবণ উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার, আদালতে দেয় অর্থ এবং জরিমানা। সৈন্য এবং সরকারি কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন। অনেক সময় দ্রব্যের মাধ্যমে কর দেওয়া হত।

সাতবাহন নথিপত্রে বাতক (উদ্যান) এবং ক্ষেত্র সম্পর্কে পরিহার অথবা অব্যাহতি দানের যে কথা বলা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে সাধারণভাবে কৃষকদের জীবন খুব সুখের ছিল না। বলা হয়েছে যে, এইসব উদ্যানে অথবা ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবে না, লবণের জন্য সেগুলি খনন করা চলবে না, জেলাপুলিশ সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, অন্যত্র কৃষকের জমিতে অনুরূপ নিরাপত্তা ছিল না। সেখানে সরকারের স্বার্থ এবং সরকারি কর্মচারীরা নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করত।

৪ক.৫.১০ সমাজ ও ধর্ম

সাতবাহনগণ ব্রাহ্মণ-প্রধান চতুর্বর্ণ সমাজ শাসন করলেও মনে হয় যে সে যুগে জাতিভেদের কঠোরতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। গৌতমীপুত্র নিজেকে 'এক ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করলেও তিনি আজীবন ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করেছিলেন। সাতবাহন বংশের সঙ্গে শকদের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। এ যুগে একদিকে যেমন উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের উপর আরোপিত হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে আদিম উপজাতি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হিন্দু সাতবাহনগণ বৈদিক ধর্ম পালন করতেন। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এই বংশের রাজারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রচুর সংখ্যক, গরু, ঘোড়া, হাতি, রথ, ইত্যাদি দান করতেন। নানাঘাট লেখতে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাসুদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র ইত্যাদি তাঁদের উপাস্য দেবতা ছিল। গাথাসপ্তশক্তিতে ইন্দ্র, কৃষ্ম, পশুপতি এবং গৌরী পূজার কথা পাওয়া যায়। শিবপালিত, বিষ্ণুপালিত ইত্যাদি নাম শিব এবং বিষ্ণু পূজার আভাস দেয়। এইভাবে বলা যায় যে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় দক্ষিণে এসেছিল।

সমগ্র সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসারলাভ হয়েছিল। সাতবাহন রাজা প্রথম দিকে এই ধর্মকে শুধু সহ্য করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে তাঁরা সক্রিয়ভাবে এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিভিন্ন লেখ, অসংখ্য গুহা এবং বৌদ্ধস্তূপ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি পশ্চিম বাণিজ্যপথ বরাবর নির্মিত হয়েছিল। সাতবাহনদের দ্বিতীয় রাজধানী জুন্নারকে ঘিরে অন্ততপক্ষে ১৩৫টি গুহা নির্মিত হয়েছিল। অমরাবতী, ঘন্টশাল ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। পুণার নিকটবর্তী ভাজার গুহাটি দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনতম। এইভাবে গুহানির্মাণ থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে গুহামন্দির বা চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কার্লের চৈত্যটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের গায়ে ১২৪ ফুট গভীরতা সৃষ্টি করে এটি নির্মিত হয়েছিল। সাধারণভাবে এই পরিকল্পনা পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য গুহার মতো হলেও আয়তনে এবং জাঁকজমকে এটি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর স্তম্ভগুলি আর আগের মতো সহজ ছিল না। সেগুলি গুরুভার এবং অলঙ্কারবহুল হয়েছিল। এই চৈত্যটিকে জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে সুন্দরতম বলা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, অথবা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি রচিত হলেও, দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী। এই সময় শক-ক্ষত্রপ এং সাতবাহনগণ নাসিকে বৌদ্ধবিহার নির্মাণের এবং নাকি এ কার্লের গুহায় বসবাসকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য অর্থ, ভূমি এবং গ্রাম দানের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই কাজ শুধু শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সামন্ত, নৃপতি, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্য তখন সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসারলাভ ঘটেছিল। তার ফলেই বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে এই কাজ সম্ভব হয়েছিল। পূর্ব দাক্ষিণাত্যে অমরাবতী এবং অন্যান্য স্থানের স্তূপগুলি প্রধানত এই ব্যক্তিগত উদ্দীপনার ফসল। সাতবাহন যুগের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং বুদ্ধমূর্তির পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, লাঙল ব্যবহারকারী গ্রামগুলির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে আংশিকভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব অনিবার্য ছিল এবং সাতবাহন রাজ্যেও তার ব্যতিক্রমও ঘটেনি। শেষ দিকের সাতবাহন রাজারা কুষাণদের অনুকরণে যুবরাজদের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই রাজারা উত্তর ভারতের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে আনুমানিক ১৪০ খ্রিস্টাব্দের ম্যাকাদনি লেখর উল্লেখ করা হয়। এই লেখতে পুলুমায়ির রাজত্বকালে জনৈক গৃহস্থ কর্তৃক একটি জলাধার নির্মাণের উল্লেখ আছে। এই গৃহস্থের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি মহাসেনাপতি খামকন্দকের সাতবাহনিহার জনপদের অন্তর্গত সেনাপতি (গুমিক) কুমার দত্তের ভেপূরক গ্রামের

বাসিন্দা ছিলেন। এই লেখ থেকে গ্রামটি কোন অর্থে সেনাপতির এবং জনপদটি কোন অর্থে মহাসেনাপতির অধীনে ছিল জানা না গেলেও, তাদের নামোল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা একদিকে রাজা, অন্যদিকে গৃহস্থের মধ্যে প্রত্যক্ষভবে সেতু রচনা করেছিল।

৪ক.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ব্যাকট্রিয় গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দারের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। সুরাষ্ট্রের ক্ষহরত ক্ষত্রপ নৃপতি নহপাণের রাজত্বকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

৩। কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৪। রাজ্যবিজেতা ও শাসকরূপে গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

৪ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী ঃ *এ কম্প্রিহেনসিভ্ হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৭); এ হিস্ট্রি অফ সাউথ ইন্ডিয়া (১৯৬৬)*

২। ডবলু. ডবলু. টার্ন ঃ *দি গ্রীকস্ ইন ব্যকট্রিয় এ্যান্ড ইন্ডিয়া (১৯৩৮)*

৩। বি. এন. মুখার্জী ঃ *দি রাইজ এ্যান্ড ফল্ অফ্ দি কুশান এম্পায়ার (১৯৮৮)*

৪। এ. এন. লাহিড়ী ঃ *করপাস্ অফ্ ইন্ডো-গ্রীক কয়েনস্ (১৯৬৫)*

৫। ভাস্কর চ্যাটার্জী ঃ *দি এজ্ অফ্ দি কুশানস্, এ নিউমিসম্যাটিক্ স্টাডি (১৯৬৭)*

একক ৪খ ❑ উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, সম্প্রসারণ, অবনতি ও পতন; দক্ষিণ ভারতে বকাটক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

গঠন

৪খ.০ উদ্দেশ্য

৪খ.১ প্রস্তাবনা

৪খ.২ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান

৪খ.২.১ গুপ্তদের উত্থান

৪খ.২.২ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

৪খ.২.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ : সমুদ্রগুপ্ত

৪খ.২.৪ রামগুপ্ত

৪খ.২.৫ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

৪খ.২.৬ পরবর্তী গুপ্তরাজাগণ : প্রথম কুমারগুপ্ত

৪খ.২.৭ ঘটোৎকচগুপ্ত ও সম্ভাব্য ভ্রাতৃবিরোধ

৪খ.২.৮ স্কন্দগুপ্ত

৪খ.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

৪খ.৪ গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

৪খ.৫ দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্য

৪খ.৬ সারাংশ

৪খ.৭ অনুশীলনী

৪খ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান কীভাবে ঘটেছিল
- গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্তের শাসনকাল থেকে শুরু করে কীভাবে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এই সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটল

- পরবর্তী দুই উল্লেখযোগ্য গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা এবং হূণ আক্রমণ
- স্কন্দগুপ্ত-পরবর্তী অধ্যায়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ও পতনের কারণসমূহ
- গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার নানা বৈশিষ্ট্য
- সাতবাহন পরবর্তী অধ্যায়ের দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

৪খ.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আপনাদের জন্যে আলোচিত হবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পুনরায় উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে কীভাবে আরেকটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের পত্তন হল তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। নানা কারণে মৌর্যযুগের পর গুপ্তযুগ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছোট হলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের অনুপাতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরও দীর্ঘায়ু হয়েছিল। গুপ্তযুগে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আজও অস্তিত্ব অটুট গুপ্তযুগে তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। গুপ্তযুগের রাজসভার ভাষা হিসাবে প্রাকৃতের স্থান নিয়েছিল সংস্কৃত। এই সংস্কৃত ভাষা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ঘটেছিল। গুপ্ত বংশের প্রথম দুই শাসক শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত কোন উচ্চতর অভিধা গ্রহণ করেন নি। এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য পশ্চিমে প্রয়াগ ও অযোধ্যা ও পূর্ব মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গুপ্তবংশীয় তৃতীয় সম্রাট 'মহারাজাধিরাজ' প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বৈশালীর লিচ্ছবি বংশীয়া রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করে তিনি গুপ্তদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বহুলাংশে বর্ধিত করেছিলেন, কারণ এর ফলে দক্ষিণ বিহারের মহামূল্য খনিগুলির উপর গুপ্তদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে সমগ্র বিহার, সমতট বাদে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বারাণসী পর্যন্ত পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করে নিজেকে 'একরাট' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য আর্যাবর্তের রাজ্যগুলিকে তিনি সরাসরি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ নীতির অবতারণা করেছিলেন। এগুলি ছিল যথাক্রমে গ্রহণ অর্থাৎ শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করা, মোক্ষ অর্থাৎ শত্রুকে মুক্তিদান করা এবং অনুগ্রহ অর্থাৎ পরাজিত শত্রুকে অনুগ্রহপূর্বক তার হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করার নীতি। সমুদ্রগুপ্তের সফল বিজয়াভিযানের বিস্তারিত বিবরণ গ্রথিত হয়েছিল হরিষেণ বিরচিত বিখ্যাত এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে যা হরিষেণ প্রশস্তিরূপে প্রসিদ্ধ। এই প্রশস্তিতে বিজিত রাজাদের চারটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক কেমন ছিল তাও এখানে বর্ণিত হয়েছিল। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে শক-কুষাণগণের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপগুলিও সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট হয়েছিল। এই বিশাল সৃষ্টি করার পর সমুদ্রগুপ্ত একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কৌটিল্যের

নীতি অনুসরণ করে তিনি সকল শ্রেণীভুক্ত বিজিত রাজ্যগুলির উপর সমানভাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব করতে প্রয়াসী হন নি। এর থেকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার সমুদ্রগুপ্ত শুধু যোদ্ধা বা সফল রাজনীতিবিদই ছিলেন না, ছিলেন মানবিক গুণের আধার। বিদ্যোৎসাহী, শস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম সমুদ্রগুপ্ত কবিতা রচনা করেছিলেন এবং সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পর প্রায় ৭৫ বছরের জন্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রামগুপ্তের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান ও সম্প্রসারণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের ভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও আচার বিশিষ্ট শকদের বিরুদ্ধে তিনি এক শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন এবং শকদের পরাজিত করে সুরাষ্ট্র ও গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হরিষেণের মতো কোন প্রশস্তি রচয়িতা ছিলেন না। তবে বিভিন্ন মুদ্রা থেকে তাঁর শারীরিক শক্তি, মানসিক উৎকর্ষ, শিল্পরুচি ও ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি 'সিংহ বিক্রম' অভিধা করেছিলেন। আবার কোন কোন মুদ্রায় তিনি নিজেকে বিক্রমাঙ্ক অথবা বিক্রমাদিত্যরূপে বর্ণনা করেছিলেন। এই অভিধাটি থেকে অনেকে তাঁকে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। এই অনুমান ঐতিহাসিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হলেও, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দ্বারা চিহ্নিত নতুন যুগের পুরোধা পুরুষরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর প্রথম কুমারগুপ্ত গুপ্তসম্রাট হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য বিজেতা হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ না হলেও, তিনি একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন যে চূড়ান্ত অবনতি শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁর রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল।

গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিরোচিত হয়। তাঁর ভিতারি স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় যে তিনি পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেছিলেন এবং হূণদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। শুধু যুদ্ধই নয়, সাম্রাজ্য শাসনেও যে তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, তার পরিচয় বহন করে জুনাগড় শিলালেখ। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তর মৃত্যুর পর থেকেই এই সাম্রাজ্যের ভাঙন পর্বের সূচনা হয়েছিল।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে একদা সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের প্রতিভাবলে যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে তা দ্রুত পতনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। সাম্রজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের সৃষ্টি এবং গুপ্ত রাজপরিবারের অন্তর্কলহ নিঃসন্দেহে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করেছিল। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের যথা বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত ও বালাদিত্যের বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বলতা সামরিক ক্ষমতাকে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এছাড়া বিহার অঞ্চলে মৌখরিদের অভ্যুত্থান ও হূণ আক্রমণের অভিঘাত সহ্য করা এই সাম্রাজ্যের পক্ষে দুরূহ হয়েছিল।

মৌর্যযুগের মতো গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং রাজাই ছিলেন সামরিক, রাজনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত সকল বিষয়ের প্রধান। কেন্দ্রীয় সচিবালয় তাঁর দ্বারা পরিচালিত

হত। তবে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না, মন্ত্রীদের পরামর্শ তিনি নিতেন, এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এছাড়া শাসন সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং নিগমসভাগুলি ভোগ করত। রাজা বিভিন্ন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে কেন্দ্রে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী সন্ধিবিগ্রহিক (শান্তি ও যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত) এবং অক্ষপটলাধিকৃত (সরকারি নথিপত্রের ভারপ্রাপ্ত) প্রধান ছিলেন। কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক (সেনাপতি), মহাবলাধিকৃত (সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক), মহাপ্রতিহার (প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান অথবা প্রতিহারদের প্রধান) প্রমুখ কর্মচারীগণ। কুমারামাত্য ও আয়ুক্তগণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যৌগসূত্র রচনা করতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি অঞ্চল যথা দেশ ও ভুক্তি অথবা রাষ্ট্রতে বিভক্ত ছিল। ভুক্তি শাসন করতেন উপরিকগণ, কুমারামাত্য, আয়ুক্ত এবং বিষয়গুলি শাসন করতেন বিষয়পতিগণ। বিষয়গুলির পরেই ছিল গ্রাম ও নগরের স্থান। গ্রামিক, মহত্তর ও ভোজকদের সাহায্যে গ্রাম শাসন চলত, আর নগর শাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন পুরপাল। তাঁকে সাহায্য করত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নগর পরিষদ। দেশ ও ভুক্তির সীমানার বাইরে ছিল সামন্ত ও গণরাজ্যগুলি। শাসনব্যবস্থাকে সূচারুরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে গুপ্তগণ রাজস্ব ব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থাকেও সুগঠিত করেছিলেন। ভারাকর অর্থাৎ ভূমিকর, ভোগকর অর্থাৎ চুঙ্গিকর এবং ভূতপ্রত্যয় অথবা আবগারি শুল্ক ছিল প্রধান।

গুপ্তযুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাস্তা, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করা হত। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সত্র, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন সাধারণভাবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার উদারতার কথা বলেছেন, তাঁর মতে এই সাম্রাজ্যের মানুষ তখন ছিল অসংখ্য এবং সুখী।

গুপ্ত শাসনের উপরোক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনেকে এই যুগকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়েছেন। তবে গুপ্তযুগের বিলাসবহুল রাজসভা, অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প, সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ কিন্তু ঐ যুগের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির দ্যোতক হয়ে ওঠে না। এই উন্নতি ছিল শ্রেণীগত ও স্থানগত দিক থেকে একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে গঠনতন্ত্রের দিক থেকে এই শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের পরস্পরবিরোধী নীতিগুলির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই শাসনপদ্ধতি বিশেষ মূল্যবান ছিল কারণ ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে এই পদ্ধতিই ছিল একমাত্র বিকল্প।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন পরবর্তী যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বকাটকগণ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নাগপুর ও বেরারের অন্তর্গত আকোলা ছিল তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন বিন্ধ্যশক্তি, তবে প্রথম প্রবরসেনের রাজত্বকালেই বকাটকদের প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেছিল। বকাটকগণ এই সময় উত্তর মহারাষ্ট্র বেরার মধ্যপ্রদেশও হায়দ্রাবাদের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে এই সাম্রাজ্য চারভাগে বিভক্ত হয় এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের শাসক হন তার পৌত্র প্রথম রুদ্রসেন। রুদ্রসেনের পরবর্তী বকাটক রাজা ছিলেন পৃথিবীসেন, যিনি প্রবল পরাক্রম গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বৈরিতা সৃষ্টি না করে সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বকাটকদের মৈত্রীবন্ধন

অটুট হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের অকালমৃত্যুর পর যখন প্রভাবতী তাঁর নাবালক পুত্রদ্বয়ের হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এরপর বকাটক সিংহাসনে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত হন দিবাকরসেন ও পরে দ্বিতীয় প্রবরসেন। পরবর্তী শাসক নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মেকলা ও মালবের রাজাগণ তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেন, এবং নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালের শেষ দিকে নলবংশীয় রাজা ভবদত্ত বর্মণের আক্রমণও বকাটকরা প্রতিহত করে। এরপর বকাটক বংশের অপর শাখা বৎসগুল্ম শাখার উল্লেখযোগ্য শাসক হরিষেণ মধ্য দাক্ষিণাত্যে বকাটকদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তাঁর মৃত্যুর পরেই দুই বর্ষব্যাপী বকাটক রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

৪খ.২ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাশার মৃত্যু হয়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্য আর একবার ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছিল। আয়তনে গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ছোট ছিল। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্য দীর্ঘায়ু হয়েছিল। মৌর্যদের তুলনায় গুপ্তদের জন্য ইতিহাসের উপকরণ বহুতর এবং বিচিত্রতর। তাই ভারত ইতিহাসে সর্বপ্রথম গুপ্তযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভভব। এবং এই ইতিহাসের সন তারিখও মোটামুটি নির্দিষ্ট।

গুপ্তযুগে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আজও বেঁচে আছে, গুপ্তযুগে তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই যুগেই ভারতীয় মহাকাব্য দুটি তাদের পরিণত রূপ পেয়েছিল। পৌরাণিক সাহিত্য এই যুগে নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন বৈদিক যুগের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে হিন্দুধর্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল। এ যুগে রাজসভার ভাষা হিসাবে প্রাকৃতের স্থান নিয়েছিল সংস্কৃত। এর ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল এবং এই ভাষা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন হতে পেরেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে বারবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও তা ততটা ফলবতী হয়নি।

অনেকে মনে করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণ বিদেশীদের বিতাড়িত করে ভারতের মুক্তি অর্জন করেছিলেন। বাসাম দুটি কারণে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করেন যে, বিদেশীরা ততদিনে আর বিদেশী থাকেনি, তারা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন যে, ভারত থেকে বিদেশী অপসারণের কাজ গুপ্ত সম্রাটদের জন্য অপেক্ষা করেনি। তাদের স্বল্প পরিচিত পূর্বসূরিগণ এ কাজ করেছিলেন।

উত্তর ভারতের গুপ্ত শাসনকে প্রায়ই 'সাম্রাজ্যিক' আখ্যা দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই বর্ণনা যথাযথ নয়। কেননা কেন্দ্রীভূত শাসন সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রকাঠামোর একটি অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং গুপ্তশাসনব্যবস্থায় এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় ছিল না। গুপ্তযুগকে ভারত ইতিহাসে অতি গৌরবময় যুগ বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে এই বর্ণনাও অতিরঞ্জিত। কেননা শ্রেণীগত ও স্থানগত, দুদিক থেকেই এই গৌরব সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ এই গৌরবের অংশীদার ছিলেন। এ যুগে তাঁদের জীবনযাত্রা একটি অভূতপূর্ব মানে পৌঁছেছিল। তাছাড়া এই গৌরব একান্তভাবে উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে উন্নত সভ্যতার বিবর্তন গুপ্তযুগে ঘটেনি, গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ঘটেছিল।

৪খ.২.১ গুপ্তদের উত্থান

তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ভারতের তিনটি অংশে বৃহৎ শক্তির উত্থান ঘটেছিল। মধ্যদেশের পশ্চিমভাগে উত্থান ঘটেছিল ভারসিব নাগদের, দাক্ষিণাত্যে বকাটকদের এবং পূর্ব ভারতে গুপ্তদের। গুপ্তদের এই উত্থান নিশ্চয়ই কোন অভাবনীয় ঘটনা নয়। এর পিছনে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। ডঃ গয়াল এই কারণগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে গুপ্তগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর গাঙ্গেয় অঞ্চলে অথবা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে অর্থাৎ প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা এবং বেনারসের মধ্যবর্তী ভূভাগ, যা অন্তর্বেদী নামে পরিচিত ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন সাসানীয়দের অধিকারে ছিল। পশ্চিম ভারত ছিল ক্ষত্রপগণের অধিকারে। দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। বকাটক বংশের প্রবরসেনের সময় সেই সম্ভাবনা বাস্তব আকার লাভ করেছিল। কিন্তু বকাটকগণের সাফল্য স্থায়ী হয়নি। সুতরাং একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার পক্ষেই নেতৃত্বদান সম্ভব ছিল। ভারতের অন্য দুইটি অঞ্চলের পক্ষে (অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকায় এবং দাক্ষিণাত্যে) তা সম্ভব ছিল না।

ডঃ গয়াল বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে গুপ্তদের উত্থানের বিশেষ যোগ ছিল। তাঁর মতে প্রায়শ প্রতিবাদী ধর্মের (বৌদ্ধ, জৈন এবং অজিবিক ধর্ম) পৃষ্ঠপোষক বিদেশীদের আধিপত্যের প্রতিক্রয়াস্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই পুনরভ্যুত্থান ছিল একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী। সুতরাং তিনি গুপ্তদের উত্থানের মধ্যে ভারতে জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখেছেন। অনেকে এই মত একেবারেই মানেন নি। তাঁরা বলেছেন যে, গুপ্তদের প্রশংসা বেশিরভাগই তাঁদের নিজস্ব লেখসমূহে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাঠোদ্ধারের পূর্ব পর্যন্ত এই লেখগুলি সম্পূর্ণ বিস্মৃত অবস্থায় ছিল।

ডঃ গয়াল মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের তুলনা করে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মৌর্যদের শাসন ও শিল্প কাঠামো ছিল প্রধানত বৈদেশিক। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা হিন্দুদের রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পসাধনায় বিশেষভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছিল। গুপ্তদের মুদ্রায় তাঁদের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমদিকে গুপ্তদের মুদ্রায় রাজা ও রানীকে কুষাণদের অনুকরণে, বিদেশী পোশাকে সজ্জিত দেখা যায়। এই মুদ্রাগুলিতে অঙ্কিত দেবীমূর্তি নামে না হলেও, বাস্তবে অরদোক্ষোর হুবহু অনুকরণ। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গুপ্তরাজাদের অঙ্গে ভারতীয় পোশাক দেখা যায়। অরদোক্ষোর স্থান গ্রহণ করেন দুর্গা অথবা লক্ষ্মী। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, মগধ প্রথম দিকে ব্রাত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, পরে তা বিদেশী প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা মগধের ছিল না। অন্যদিকে, কুষাণ-পরবর্তী যুগে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৃহত্তম ঘাঁটি, উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার সে যোগ্যতা পুরোপুরি ছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চল প্রাক্-গুপ্তযুগে এবং গুপ্তযুগের প্রথম দিকে, বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। স্বর্ণমুদ্রার ১৪টি ভাণ্ডার এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের রোমান মুদ্রাও এখানে পাওয়া গেছে। সুতরাং শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল, বলা যায়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং সেনাবাহিনীতে নতুন মর্যাদা লাভ করেছিল। মনু বলেছেন যে কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা, সেনাপতি এবং দণ্ডধর হতে পারেন। কামন্দকের নীতিসারে এই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি শুধু নীতিগতভাবে দেওয়া হয়নি, কার্যত দেওয়া হয়েছিল। এ যুগে পরিবর্তিত মহাভারতে ব্রাহ্মণ গৌরবের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, ব্রাহ্মণ ভৃগু পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার পর তা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বণ্টনের জন্য তাঁর পুরোহিত কশ্যপের হাতে তুলে দেন।

ডঃ পি. এল. গুপ্ত গুপ্তদের উত্থানের ব্যাখ্যা হিসাবে অন্য একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে ভারতের তিন প্রান্তে, শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। অথচ তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বকাটক এবং নাগগণ পরস্পরের উপর নির্ভর করে আপন শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। বকাটকদের সঙ্গে গুপ্তদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘকাল বজায় ছিল। তাঁদের এই পারস্পরিক বোঝাপড়া গুপ্তদের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, গুপ্তবংশের প্রথম দুজন শাসক গুপ্ত এবং ঘটোৎকচ শুধুমাত্র "মহারাজা" ছিলেন এবং ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম "মহারাজাধিরাজ" এই উচ্চতর অভিধা গ্রহণ করেন। প্রথম দুজনের "মহারাজা" অভিধা থেকে অনেকে মনে করেন যে তাঁরা কারও অধীনে সামন্ত নরপতি মাত্র ছিলেন, স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, গুপ্তযুগের পরবর্তী অধ্যায়ে "মহারাজা" বলতে অনেক সময় সামন্ত নৃপতি বোঝাত, কিন্তু গুপ্তপূর্ব যুগে অথবা গুপ্তযুগের প্রথম দিকে তা বোঝাত না। তখন অনেক স্বাধীন নৃপতিও 'মহারাজা' অভিধা গ্রহণ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতবাহন, ভারসিব নাগ, বকাটক এবং কৌশাম্ভবীর মঘদের উল্লেখ করা যায়।

গুপ্ত কোন অঞ্চল শাসন করতেন সঠিক বলা যায় না। মৃগশিখাবনের সঙ্গে সারনাথের যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে বলা যায় যে, বেনারস অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে পশ্চিমে এই রাজ্য প্রয়াগ ও অযোধ্যার দিকে, এবং পূর্বে মগধের দিকে কিছুদূর বিস্তৃত ছিল।

গুপ্তের শাসনকালও সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। স্মিথ তাঁকে ২৭৫-৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক এই মত মেনে নিয়েছেন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজত্বের অবসান হয়েছিল।

৪খ.২.২ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

"মহারাজাধিরাজ" প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সমুদ্রগুপ্তকে সর্বদা "লিচ্ছবিদৌহিত্র" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে এই বিবাহ সম্পর্কের তাৎপর্যের আভাস পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক দিকে থেকে এই বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মনে করা হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একশ্রেণীর মুদ্রায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এই মুদ্রার একদিকে প্রথম স্কন্দগুপ্ত এবং তাঁর পত্নী কুমারদেবীর নাম ও চিত্র, অন্যদিকে সিংহের উপর উপবিষ্টা দেবীমূর্তি এবং "লিচ্ছবয়ঃ" কথাটি পাওয়া গেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা

যায় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি সম্পর্কে তাঁর সৌভাগ্যের সূচক মনে করেছিলেন। এ্যালানের মতে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পিতা-মাতার বিবাহকে স্মরণীয় করার জন্য এই মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, লিচ্ছবিগণ ও লিচ্ছবি দুহিতা কুমারদেবীর সঙ্গে যুক্তভাবে এই মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, এ. এস. আলটেকার এই মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিবাহের ফলে গুপ্তরাজ্যের সঙ্গে লিচ্ছবি রাষ্ট্র যুক্ত হয়েছিল এবং এই মিলিত রাষ্ট্রের সিংহাসনে সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারের দাবিকে সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর সম্পর্কে "লিচ্ছবিদৌহিত্র" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

ডঃ গয়াল কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এই মৈত্রী সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তখন ভারসিব নাগ এবং বকাটকগণের মৈত্রীর ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছিল। গুপ্ত-লিচ্ছবি মৈত্রীর ফলে তা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মৈত্রীর ফলে গুপ্তগণ দক্ষিণ বিহারের মহামূল্য খনিগুলির উপর তাঁদের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁরা যে খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছিলেন, মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সম্পদ লাভের ফলে গুপ্তগণ উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানা যায়। তবে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্পর্কে পরোক্ষভাবে ধারণা করা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব ভারতে সমুদ্রগুপ্ত কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি। তাই মনে হয় যে, সমতট বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট বঙ্গদেশ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমে তাঁর রাজ্য বিদিশার প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছিল, কেননা বকাটকগণ তখন বিদিশা শাসন করতেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমগ্র বিহার, সমতট বাদে সমগ্র বঙ্গাদেশ এবং বারাণসী পর্যন্ত পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ পরবর্তী শাসক হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের নির্বাচন। সমুদ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না কিন্তু যোগ্যতম ছিলেন। তাই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে নির্বাচিত করেন।

সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়ন তাঁর ভাইদের ('তুল্য কুলজ') মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ডঃ গয়াল মনে করেন যে অভিজাত শ্রেণীর একাংশ এই বিক্ষোভের শরিক হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল যে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের ফলে রাজসভায় লিচ্ছবিদের, অর্থাৎ ব্রাত্য সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্য পত্নীর গর্ভজাত, সিংহাসন বঞ্চিত, যুবরাজ কাচের মধ্যে তাঁদের স্বাভাবিক নেতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে কাচ বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ছিলেন, কেননা বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত ও কাচের সংগ্রাম শুধু দুইজন ব্যক্তির সংগ্রাম ছিল না, এটা ছিল অংশত দুটি ভিন্ন আদর্শের সংগ্রাম। রাজসভার উপদলীয় দ্বন্দ্ব এই সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাচের মুদ্রা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে (বালিয়া, তাণ্ডা, জৌনপুর ইত্যাদি স্থানে) পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটি ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্গবিশেষ। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং এর পিছনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন ছিল। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প* অনুসারে কাচের সাফল্য মাত্র তিন বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর পরিমিত সংখ্যক মুদ্রাও একই ইঙ্গিত বহন করে।

৪খ.২.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ—সমুদ্রগুপ্ত

গুপ্তসম্রাটগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ সমুদ্রগুপ্ত। ভারতীয় ঐতিহ্যে তিনি একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি নন। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ এবং যবদ্বীপের একখানি গ্রন্থ, *তন্ত্রি-কামাঙ*-এ তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। ওয়াং-হিউয়েন-সি তার সঙ্গে সিংহল দ্বীপের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলেছেন। সমুদ্রগুপ্তের অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, তাঁর জীবন ও রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়। একটিতে তিনি তীরধনুক-সহ দণ্ডায়মান, দ্বিতীয়টিতে, তাঁর হাতে একটি কুঠার, তৃতীয়টিতে তাঁর পদদলিত একটি ব্যাঘ্র, চতুর্থটিতে তিনি বীণাবাদনরত এবং পঞ্চমটি, অশ্বমেধের স্মারক। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে তাঁর যে সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলা হয়েছে, এই মুদ্রাগুলি যেন তারই অভিজ্ঞান।

সমুদ্রগুপ্তের জন্য দুইটি লেখ বিশেষ মূল্যবান। একটি, মধ্যপ্রদেশের এরাণ লেখ, অন্যটি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখ, বা হরিষেণ প্রশস্তি। এর মধ্যে হরিষেণ প্রশস্তির গুরুত্ব সমধিক। এ ছাড়া নালন্দায় এবং গয়ায়, যথাক্রমে ৫ ও ৯ বৎসরের দুটি তাম্র লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখ দুটিতে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

এলাহাবাদ লেখটি অশোকস্তম্ভের উপর রচিত। শুধু সমুদ্রগুপ্ত নয়, সমগ্র গুপ্তযুগের জন্য এই লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্বের ও কৃতিত্বের বিশদ বিবরণ আছে। সমুদ্রগুপ্তের জন্য এটিই আমাদের মুখ্য উপাদান। এতে ৩৩টি পংক্তি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর অংশবিশেষ ভেঙে যাওয়ায় এ থেকে ঘটনাপরম্পরা নির্ধারণ করা কঠিন। এই লেখটি দিগ্বিজয়ের পরে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে রচিত, কেননা এতে এই অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ নেই। অলঙ্কারবহুল সংস্কৃতে এই লেখটি রচিত। অশোকের সরল, বিনত এবং প্রাকৃতে রচিত লেখগুলির সঙ্গে এই লেখটির তুলনা করলে দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য, তা বোঝা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন এবং নিজেকে 'একরাট'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি আর্যাবর্তে এবং দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আর্যাবর্তে তিনি শুধু রাজ্যজয়ই করেননি, বিজিত রাজ্যগুলিকে সরাসরি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি তা করেননি। সেখানে তাঁর রাজ্যজয়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমটি গ্রহণ, অর্থাৎ শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করা, দ্বিতীয়টি মোক্ষ, অর্থাৎ শত্রুর মুক্তিদান এবং তৃতীয়টি অনুগ্রহ, অর্থাৎ পরাজিত শত্রুকে অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ। দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রগুপ্তের এই পরিবর্তিত নীতি, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলে মনে করা হয় বলা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্য কার্যকরভাবে শাসন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না, তাই তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে এই আবেক্ষিক উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সবই সত্য, কিন্তু এই একমাত্র সত্য নয়। এই উদার নীতির পিছনে যে, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে গুপ্তদের সময় রাজ্যজয়কে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এই বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগে, অত্যধিক দূরত্বের জন্য, বলপ্রয়োগের সাহায্যে বসতিস্থাপন সম্ভব ছিল না। অপরিষ্কৃত জমির পরিমাণও তখন তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল। তাছাড়া পলিমাটিবিধৌত গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষদের উৎখাত করে, অপেক্ষাকৃত অনুর্বর দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়াও সহজ ছিল না। তাই

দক্ষিণাপথের রাজারা পরাজিত হওয়ার পর পুনরায় তাঁদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেককেই কর দিতে হত। পরাজিত এইসব রাজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে গুপ্তসম্রাটগণ একটি আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু মার্জিত রাজসভা, ও একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং এজন্য তাঁদের জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাতে হয়নি। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় এবং গুপ্তসম্রাটগণের বিভিন্ন সনদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছেন যে, গুপ্তযুগে বসতিস্থাপনে ধর্ম এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্য বলপ্রয়োগের স্থান গ্রহণ করেছিল। এইভাবে বর্ণের ছদ্মবেশে সেখানে একটি নতুন শ্রেণীর পত্তন করা হয়েছিল।

হরিষেণ প্রশস্তির সপ্তম স্তবকে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশটি ভগ্ন হওয়ায় এই স্তবকের সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখানে অচ্যুত, নাগসেন, গণপতিনাগ এবং কোটা-পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জয়লাভের কথা আছে। তারপরে বলা হয়েছে যে, তিনি পুষ্পনগরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। অচ্যুত সম্ভবত বেরিলির নিকট অহিচ্ছত্রের রাজা ছিলেন। নাগসেন ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত পদ্মবতীর নাগবংশীয় রাজা। গণপতিনাগের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বেশি, কেননা, তাঁর মুদ্রা বিদিশাতে পাওয়া যাওয়ায় তাঁর রাজ্যকে এখানে স্থান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গণপতিনাগের মুদ্রা অনেক বেশি সংখ্যায় মথুরায় পাওয়া গেছে। সুতরাং তাঁকে মথুরার রাজা মনে করাই সঙ্গত। কোটা-পরিবার সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁদের মুদ্রা পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লিতে পাওয়া গেছে। তাঁরা বুলন্দশহর শাসন করতেন। এইসব রাজ্যের ভৌগোলিক পরিচয় থেকে মনে হয় যে, এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখতে 'পুষ্প' বলতে কান্যকুব্জ বা কনৌজ বোঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে কান্যকুব্জের নাম ছিল পুষ্পপুর। তাই অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত কান্যকুব্জ থেকে উপরে উল্লিখিত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, কেননা উত্তর-পশ্চিমে অহিচ্ছত্র, পশ্চিমে মথুরা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মাবতী এখান থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন (১২৫ থেকে ১৫০ মাইলের মধ্যে) ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে কেন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, অনেকে তার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পশ্চিমের নাগগণ ছিলেন, সমগ্র আর্যাবর্তে, গুপ্তদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাগদের সঙ্গে তখন বকাটকগণের মৈত্রীসম্পর্ক ছিল। নাগদের বিরুদ্ধে অভিযানে বিলম্ব হলে, বকাটকগণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত করবেন, এমন আশঙ্কা ছিল। সুতরাং নাগদের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভ সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়েছিল। তাছাড়া নাগ ও বকাটক উভয় রাজ্যেই তখন অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে বিশেষত বকাটকরাজ প্রথম প্রবরসেনের মৃত্যুর পর নাগ-বকাটক মৈত্রীর উপর চাপ পড়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর শত্রুদের এই বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্তগণ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক, এবং নাগগণ শিবের। সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে নাগরাজ্য আক্রমণের এও এক অন্যতম কারণ ছিল।

নাগদের পরে সমুদ্রগুপ্ত হয়তো বকাটকগণের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের এরাণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত এখানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধজয়ের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, বকাটকগণ তাঁদের উত্তর ভারতীয় অঞ্চলগুলি হারিয়েছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায়ের মতে সমুদ্রগুপ্ত বকাটকদের কাছ থেকে এরাণ জয় করেননি, খুব সম্ভব, পশ্চিমের ক্ষত্রপদের কাছ থেকে করেছিলেন। তাঁর মতে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক মহাক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসেন পরাজিত হয়েছিলেন।

এইভাবে গঙ্গা ও দোয়াব অঞ্চলের সমভূমির উপর তাঁর অধিকার সুদৃঢ় করার পর সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বের হন। হরিষেণ প্রশস্তির এই পর্যায়ে যে-সব রাজ্য অথবা উপজাতি সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই নামগুলি সেখানে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্ক বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে দক্ষিণাপথের (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের) বারোটি রাজা ও রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। এঁদের সম্পর্কে সমুদ্রগুপ্ত গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর্যাবর্তের নয় জন রাজার নাম আছে। উত্তর ভারতের এই রাজাদের তিনি উন্মূলিত এবং তাঁদের রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আটবিক রাজাগণ, পাঁচটি প্রত্যন্ত রাজ্যের নরপতিগণ এবং নয়টি উপজাতীয় প্রজাতন্ত্র, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। আটবিক রাজাদের তিনি দাসত্বের (পরিচারকীকৃত) পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। অন্যদের তাঁকে সর্বপ্রকার কর দিতে হত (সর্বকরদান), তাঁর আদেশ মান্য (আজ্ঞাকরণ) করতে হত এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রণাম নিবেদন (প্রণামাগণ) করতে হত। চতুর্থ শ্রেণীতে কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্বাধীন এবং অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা বিভিন্নভাবে সমুদ্রগুপ্তের সন্তোষবিধান করতেন।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারসূত্রে যে অঞ্চল লাভ করেছিলেন, সেই অঞ্চল, এবং হরিষেণ প্রশস্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত যে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন। এই রাজাদের সম্পর্কে 'উন্মূল্য' শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া দক্ষিণাপথের রাজাদের ক্ষেত্রে যেমন রাজা ও রাজ্যের নাম দুইয়েরই উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজাদের ক্ষেত্রে, তা নেই। সেখানে শুধু রাজার নাম আছে, রাজ্যের নাম নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই রাজ্যগুলি সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হরিষেণ প্রশস্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়। সেই নামগুলি হল, রুদ্রদেব, মতিল, চন্দ্রবর্মন, নাগদত্ত, নাগসেন, গণপতিনাগ, অচ্যুত, নন্দী এবং বলবর্মন। রাজ্যের নামের উল্লেখ না থাকায় এই রাজাদের সনাক্ত করা কঠিন। তাছাড়া পরাজিত সব রাজাই যে এখানে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাও মনে হয় না। কেননা এই প্রশস্তিতে রাজাদের নামের পরে, "এবং আর্যাবর্তের আরও অনেক রাজা" এই অস্পষ্ট কথাগুলি আছে।

রুদ্রদেব কে ছিলেন, তা এখনও অনিশ্চিত। একসময় মনে করা হত যে, তিনি এবং বকাটক রাজা প্রথম রুদ্রসেন অভিন্ন। ডঃ পি. এল. গুপ্ত কৌশাম্বীয় মুদ্রায় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের যে রাজা রুদ্রের নাম পাওয়া গেছে, তাঁকে রুদ্রদেব বলে সনাক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে, আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থলে, একদা এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ যেখানে ছিল, সেখানেই এই মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া হস্তলিপির দিক থেকেও এই লেখ ও মুদ্রার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

বুলন্দশহরে (উত্তরপ্রদেশ) একটি সিলের উপর মত্তিলার নাম পাওয়া গেছে। অনেকে তাঁকে মতিল বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মত্তিলার নামের সঙ্গে কোন সম্মানসূচক অভিধা না থাকায় তিনি যে রাজা ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না।

চন্দ্রবর্মণকে সাধারণত সিংহবর্মণের পুত্র, পুষ্করণের রাজা চন্দ্রবর্মণ বলে মনে করা হয়। বাঁকুড়ার নিকট শুশুনিয়া পাহাড়ের লেখতে চন্দ্রবর্মণের নাম পাওয়া গেছে। পুষ্করণকে মনে করা হয় শুশুনিয়ার নিকটস্থ, বর্তমান পোখরণ।

গণপতিনাগ, নাগসেন এবং নন্দী, তিনজনই নাগবংশীয় ছিলেন বলে মনে হয়। গণপতিনাগ এবং নাগসেনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নন্দী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

নাগদত্তের নাম থেকে মনে হয় যে, তিনিও নাগবংশীয় ছিলেন। বলবর্মণের পরিচয়ও অনিশ্চিত।

অনেকে এই নয়জন রাজাকে পুরাণে-বর্ণিত 'নব নাগ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই অনুমান সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

এই নয়জন রাজা ও তাঁদের রাজ্যের যে পরিচয় জানা গেছে তার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, মধ্য-ভারতের অংশবিশেষ এবং বঙ্গাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর বঙ্গাদেশ জয়ের পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি এর দ্বারা সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাম্রলিপির বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

আর্যাবর্ত জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত আটবিক রাজ্যগুলি জয় করেন। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে এই রাজ্যগুলি জব্বলপুরে এবং গাজিপুরে অবস্থিত ছিল। এরাণ লেখ থেকে এই রাজ্যগুলি জয়ের আভাস পাওয়া যায়। ডঃ পি. এল. গুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের গাজিপুরের আটবিক রাজ্যজয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর আগেই এলাহাবাদ থেকে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ভৌগোলিক দিক থেকে গাজিপুর ছিল এই দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী। সমুদ্রগুপ্ত এই আটবিক রাজ্যগুলি জয় করে তাঁর দক্ষিণাপথ অভিযানের পথ সুগম করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের এই রাজ্যজয় 'প্রত্যন্ত নৃপতি' এবং উপজাতি রাষ্ট্রগুলির উপর গভীর বিস্তার করেছিল এবং তাঁরা নানা উপায়ে তাঁর 'প্রচণ্ড শাসনের' পরিতোষসাধন করেছিলেন। হরিষেণ প্রশস্তিতে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এই সীমান্ত রাজ্যগুলির বিবরণ থেকে, পরোক্ষভাবে, সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই সীমান্ত রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবই উত্তর ও পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যগুলির নাম সমতট, কামরূপ, নেপাল, দবক এবং কর্তৃপুরা। সমতট বলতে সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বোঝায়। এর রাজধানী ছিল কমিল্লা জেলার অন্তর্গত বড় কামতা। কামরূপ বলতে আসামের গৌহাটি জেলা এবং বৃহত্তর কিছু অঞ্চল বোঝায়। নেপাল বহু পরিচিত। দবকের অবস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বেশি। অনেকে দবক এবং ঢাকাকে অভিন্ন মনে করেছেন। কারও কারও মতে দবক ছিল চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল। কিন্তু খুব সম্ভব দবক ছিল আসামের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত দবোক। কর্তৃপুরার অবস্থিতিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে এটি ছিল লজন্ধর জেলার কর্তারপুর। আবার কারও কারও মতে এটি ছিল কুমালন গাড়োয়াল-রহিলখন্দ অঞ্চল।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী উপজাতি রাজ্যগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে ছিল পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মালবগণ, অর্জুনায়নগণ, যৌধেয়গণ এবং মদ্রকগণের রাজ্য। সমুদ্রগুপ্তের সময় মালবগণ খুব সম্ভবত মেওয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের টংক এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করেছিল। অর্জুনায়নগণের বাসস্থান ঠিক কোথায় ছিল জানা যায় না। তারা আগ্রা এবং মথুরার পশ্চিমে, জয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে বাস করত, বলা যায়। যৌধেয়গণের বাসস্থানও অনিশ্চিত। খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম দিকে তারা

রাজস্থানের অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যে বাস করত। কিন্তু শকক্ষত্রপ রুদ্রদামন কর্তৃক পরাজিত হয়ে তারা সেখান থেকে সরে যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় তারা সম্ভবত শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করত এবং তাদের রাজধানী ছিল লুধিয়ানার নিকবর্তী সুনেত। একদা মদ্রকদের বাসস্থান ছিল পাঞ্জাব এবং তাদের রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের সময় হয়তো তারা বিকানীরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভদ্র নামক স্থানে বাস করত। পাণিনি বলেছেন যে, মদ্র এবং ভদ্র ছিল একই স্থানের দুইটি ভিন্ন নাম।

দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি উপজাতি রাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আরও বেশি। এগুলি ছিল আভিরগণ প্রার্জুনগণ, সোনাকানিকগণ, কাকগণ এবং খরপরিকগণের রাজ্য। আভিরগণের প্রধান বসতি ছিল পশ্চিম রাজপুতানায়। কিন্তু মধ্যভারতে, ঝাঁসি এবং ভিলসার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁদের অন্য একটি বসতি ছিল। অনেকের মতে হরিষেণ প্রশস্তিতে এই দ্বিতীয় বসতির কথা বলা হয়েছে। ডঃ গুপ্ত মনে করেন যে সমুদ্রগুপ্তের সময় আভিরগণ এই অঞ্চলে আসেনি। তখন তাঁদের বাসভূমি ছিল নিম্নসিন্ধু উপত্যকা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব। কারও কারও মতে মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলা প্রার্জুনগণের বাসস্থান ছিল। কিন্তু এই অনুমান সত্য নাও হতে পারে কেননা অর্থশাস্ত্রে গান্ধারগণের সঙ্গে প্রার্জুনগণের নাম উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং প্রার্জুনগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীও হতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, সোনাকানিকগণ ভিলসার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু হরিষেণ প্রশস্তিতে সোনাকানিকগণের স্থান প্রার্জুন এবং কাকগণের মধ্যস্থলে হওয়ায় অনেকের মতে তাদের বাসভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ভিলসার কুড়ি মাইল উত্তরে কাকপুর গ্রাম, অনেকের মতে কাকগণের বাসস্থান ছিল। অনেকের মতে তাদের বাসভূমি ছিল কাশ্মীর। খরপরিকগণকে অনেকে মধ্যপ্রদেশের দামো জেলায় স্থান দিতে চেয়েছেন কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহের অবসান ঘটেনি। অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অব্যবহিত পরে বাস করত।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, সমুদ্রগুপ্ত উপজাতি রাজ্যগুলিকে গ্রাস না করে তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, জাতিগত দিক থেকে, সামাজিক-রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে, গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষ এবং এই উপজাতিদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাই তিনি তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সমস্যার সৃষ্টি করতে চাননি। তিনি তাদের তাঁর সাম্রাজ্যের প্রথম রক্ষাপ্রাচীর হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে অনেকের বক্তব্যের সুর কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা বলেন যে, সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের ফলে নিশ্চিতভাবে এই অঞ্চলের উপজাতি প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষমতা চূর্ণ হয়েছিল।

হরিষেণের বর্ণনামূলক তালিকা থেকে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। দেখা যায় যে, পশ্চিমে, এই অঞ্চলের ঠিক পরেই উপজাতি গণরাজ্যগুলির একটি বলয় তৈরি হয়েছিল। এই বলয়ের একদিকে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের মালবগণ, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছিল খরপরিকগণ। পূর্বে দক্ষিণপূর্ব অংশ ভিন্ন সমগ্র বঙ্গাদেশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। উত্তরে এই অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দক্ষিণে এই অঞ্চলের সীমান্ত মধ্যপ্রদেশের সৌগর জেলার এরাণ থেকে জব্বলপুর এবং পরে বিন্ধ্য পর্বত-বরাবর বিস্তৃত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, পশ্চিম ভারতের শকগণ তখনও পর্যন্ত অপরাজিত ছিল। রাজস্থানের উপজাতিগণ সমুদ্রগুপ্তকে শুধুমাত্র কর দিত। পাঞ্জাব তখনও তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

আটবিক রাজ্যগুলি জয় করার ফলে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে দক্ষিণাপথের বারোটি রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। সবগুলি অভিযানের পরিচালনা ভার যে তিনি নিজে নিয়েছিলেন, তা বলা যায় না। হরিষেণ প্রশস্তিতে দক্ষিণাপথের বারোজন রাজা ও তাঁদের রাজ্যের নাম প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের সম্পর্কের গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণাপথের এই বারোটি রাজ্য ও তাদের রাজার নাম হল ঃ কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কুরলের মন্তরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি, কোট্টুরের স্বামিদত্ত, এরগুপল্লের দমন, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গির হস্তিবর্মণ, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের এবং কুস্থলপুরের ধনজয়।

এই রাজ্যগুলির সকলের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কোশল বলতে এখানে দক্ষিণ কোশল বোঝানো হয়েছে। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, রায়পুর, দ্রুগ এবং ওড়িশার ও সম্বলপুর-গঞ্জামের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাকান্তার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা খুব বেশি। ডঃ রায়চৌধুরী মহাকান্তার বলতে মধ্যভারতের অরণ্যভূমি বুঝিয়েছেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, এখানে ওড়িশার জয়পুর অরণ্যকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পরবর্তীকালের লেখতে এই অরণ্যকে 'মহাবন' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, 'মহাবন' এবং মহাকান্তার সমার্থক। কুরলের অবস্থিতি একেবারেই অনিশ্চিত। শুধুমাত্র এই রাজ্য যে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল, তা বলা যায়। পিষ্টপুরম বর্তমান গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিথপুরম। কোট্টুরের পরিচয় অনিশ্চিত। এমন হতে পারে যে, কোট্টুর ছিল গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরির ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কোথুর অথবা ভিজাগাপটম জেলার পাহাড়ের পাদদেশের কোট্টুর। এরন্ডুপল্ল হয়তো ছিল ভিজাগাপটম জেলায়। কাঞ্চি হল চিঙ্গোলপুট জেলার কাঞ্চিপুরম। অবমুক্ত হয়তো ছিল কাঞ্চি ও বেঙ্গির মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পলক্ক ছিল গুন্টুর অথবা নেল্লোর জেলায়। সম্ভবত দেবরাষ্ট্র ছিল ভিজাগাপটমে এবং কুন্থলপুর, উত্তর আর্কটে।

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ অভিযানের দ্বারা তাঁর সাম্রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেননি। সুতরাং তাঁর এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে আসে। ডঃ জয়সোয়াল বলেছেন যে, পল্লব সেনাবাহিনী ধ্বংস করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল। কেননা সমুদ্রগুপ্ত জানতেন যে, দক্ষিণ থেকে পল্লববাহিনী এবং বুন্দেলখন্দ থেকে বকাটকগণ বিহার আক্রমণ করলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ সঙ্কটের সৃষ্টি হবে। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, এই মতবাদ একান্তভাবে ভিত্তিহীন, কেননা যে ধারণার উপর নির্ভর করে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে, সেই ধারণাই এখনও পর্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ হয়নি। এই ধারণাটি এই যে, পল্লবগণ বকাটকবংশের একটি শাখা ছিল। তিনি বলেছেন যে, তাই যদি হয় তাহলে সমুদ্রগুপ্ত যখন পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন তখন বকাটকগণের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় নি কেন। ডঃ গয়াল বলেছেন যে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চল এবং মালাবার উপকূলে তাঁর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, এ থেকেই তাঁর অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যায়। এই অঞ্চলের অপরিমিত সম্পদ তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। প্রথম চার খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রচুর সংখ্যক রোমান স্বর্ণমুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, সমুদ্রগুপ্ত একবারই দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে। আর্যাবর্তে বিভিন্ন রাজাদের তিনি যদি একাধিকবার আক্রমণের ফলে পরাজিত করে থাকেন, তাহলে দাক্ষিণাত্যেও তিনি যে তাই করেননি, তা বলা যায় না। হরিষেণ প্রশস্তিতে এ সম্পর্কে কোন

স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এই প্রশস্তি থেকে তাঁর আক্রমণপথেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আর্যাবর্তের তুলনায় পর্বতসঙ্কুল দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা যে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর বৃহৎ সেনাবাহিনীর পক্ষে উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজাসুজি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। একমাত্র পূর্ব উপকূলরেখা ধরে তা সম্ভব ছিল। অনুমান করা যায় যে, তিনি মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে ওড়িশার উপকূলভাগের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তারপর গঞ্জাম, ভিজাগাপটম, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং নেল্লোর জেলা অতিক্রম করে মাদ্রাজের দক্ষিণে কাঞ্জিপুরমে পৌঁছেছিলেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্তের এই অভিযানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। তবে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের উপর তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের কথা স্মরণ করলে তাঁর যে শক্তিশালী নৌবহর ছিল, তা বলা যায়। ডঃ গয়াল বলেন, এমনও হতে পারে যে কাঞ্চি এবং কুরলের মতো উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিকে তাঁর নৌবহর সরাসরি আক্রমণ করেছিল। অনেকের মতে সমুদ্রগুপ্ত ফেরার পথে পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি রাজ্য জয় করেছিলেন। দুব্রেইল মনে করেন যে, কাঞ্চির রাজা বিষ্ণুগোপের নেতৃত্বে গঠিত একটি রাজ্যজোট সমুদ্রগুপ্তকে পরাজিত করে এবং এর ফলে তিনি বিজিত রাজ্যগুলি পরিত্যাগ করে দ্রুত ফিরে আসতে বাধ্য হন। ডঃ গুপ্ত এই অনুমানকে একান্তভাবে "কল্পনানির্ভর" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত খুব সম্ভবত বেঙ্গি এবং কাঞ্চি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং হস্তিবর্মণ ও বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেছিলেন। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণাপথের এই অংশে তিনি বেঙ্গি ও কাঞ্চির রাজার মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ডঃ ত্রিপাঠি মনে করেন যে, তিনি হয়তো দূর দক্ষিণ ভারতে চেররাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মহারাষ্ট্র ও খান্দেশের মধ্য দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

হরিষেণ প্রশস্তির প্রথম শ্রেণীভুক্ত বারোটি রাজ্য ও বারো জন রাজার মধ্যে বকাটক রাজ্য অথবা তার রাজা, সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন, প্রথম রুদ্রসেনের কোন উল্লেখ নেই। তাই অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করেননি।

অন্যদিকে ডঃ গয়াল মনে করেন যে, প্রথম রুদ্রদেব এবং রুদ্রসেন অভিন্ন ছিলেন। তিনি বলেন যে সেই সময় বকাটকদের রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল। প্রথম পৃথিবীসেনের পরে আর কোন বকাটক রাজা 'সম্রাট' অভিধা গ্রহণ করেননি। তাঁরা 'মহারাজা' অভিধাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই 'মহারাজা' অভিধা তাঁদের স্বাধীনতার পরিচায়ক, কিন্তু সাম্রাজ্য মহিমার পরিচায়ক নয়। তাঁর মতে, এই পরিবর্তিত অভিধা, বকাটকদের পরাজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতের অভ্যন্তরে একটি দেশীয় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে সীমান্তপারের বিদেশী শাসকগণ উদাসীন থাকতে পারেননি। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, তাঁরা দ্রুত সমুদ্রগুপ্তের কাছ থেকে শান্তি ক্রয় করেছিলেন। হরিষেণ প্রশস্তিতে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত এই সব স্বাধীন অথবা অর্ধ-স্বাধীন নরপতিদের উল্লেখ আছে। এই সব বিদেশী প্রকৃতপক্ষে কারা এবং সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক ছিল, এ বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে। এই বিদেশীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিষেণ প্রশস্তিতে, "সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপের" কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে "দৈবপুত্র শাহী শাহানুশাহী-শক-মুরুন্ড" এই সংযুক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চীন সম্রাটের অভিধা "দেবপুত্র" বিভিন্ন কুষাণ সম্রাটগণ ব্যবহার করেছিলেন আমরা জানি। "শাহানুশাহী" ছিল পারস্য সম্রাটের অভিধা। শকদের

মাধ্যমে কুষাণগণ এই অভিধাটিও গ্রহণ করেছিলেন। তাই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, "দৈবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী" বলতে এখানে কাবুল ও পাঞ্জাবের একাংশের কুষাণ শাসককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই অভিমত সত্য বলে মনে হয় না। কেননা চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় পাদে এমন আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা গ্রহণের উপযুক্ত কোন কুষাণ শাসক এই অঞ্চলে ছিলেন না। তাই ডঃ গয়াল মনে করেন যে "দৈবপুত্রশাহী" বলতে একজনকে এবং "শাহানুশাহী" বলতে অন্য একজনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই সংযুক্ত শব্দটিতে, একজন নয়, দুইজন শাসককে বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন কুষাণনৃপতি ছিলেন কিদার। তিনি কুষাণপরিবারের মানুষ ছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের কাছে তিনি দেবপুত্র-পরিবারের রাজা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। 'শাহানুশাহী' অভিধা গ্রহণের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তিনি শুধুমাত্র একজন 'শাহী' ছিলেন। 'কিদার কুষাণ শা' শব্দসম্বলিত তাঁর মুদ্রা এই কথাই প্রমাণিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হরিষেণ প্রশস্তিতে 'দেবপুত্র' শব্দটি অভিধা হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। দেবপুত্রের তদ্ধিত প্রত্যয় 'দৈবপুত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং "দৈবপুত্র" শব্দটি, পরবর্তী "শাহী" শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত, একথা বলা যায়। এই হিসাবে "দৈবপুত্র শাহী" একটি সংযুক্ত শব্দ ধরলে তার অর্থ দাঁড়ায়, "শাহী, যিনি দেবপুত্র পরিবারের মানুষ ছিলেন।" এখন "শাহানুশাহী" বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, তিনি কিদারের সমসাময়িক সাসানীয় "শাহানশাহ" দ্বিতীয় সাপুর ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন না।

হরিষেণ প্রশস্তিতে ব্যবহৃত 'শক মুরুণ্ড' শব্দটিও কম বিপত্তির সৃষ্টি করেনি। অনেকে 'শক-মুরুণ্ড'কে একটি সংযুক্ত শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে 'মুরুণ্ড' একটি শক শব্দ যার অর্থ 'স্বামী' অথবা প্রধান। সুতরাং 'শক-মুরুণ্ড' শব্দের অর্থ শক-প্রধান। এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে হরিষেণ প্রশস্তিতে শকমুরুণ্ড বলতে পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র শকশাসকদের বোঝানো হয়েছে। অনেকে আবার মুরুণ্ডদের শকদের থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, মুরুণ্ড একটি উপজাতির নাম। একথা সত্য। এবং তাঁরা যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি শক্তিশালী মুরুণ্ড রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের লেখতে উল্লিখিত মুরুণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কেননা গাঙ্গেয় উপত্যকা ইতিপূর্বেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া মুরুণ্ড রাজ্য ছিল পূর্ব ভারতে, কিন্তু হরিষেণ প্রশস্তিতে শক-মুরুণ্ড শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্ত-পরবর্তী অঞ্চলের শাসকদের প্রসঙ্গে।

এই বিদেশী শক্তিসমূহের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক প্রসঙ্গে হরিষেণ প্রশস্তিতে 'আত্মনিবেদন' 'কন্যোপায়ন দান' এবং 'গুরুৎমদ অঙ্ক-স্ব-বিষয়ক-ভুক্তি-শাসন-যাচনা'র কথা বলা হয়েছে। 'আত্মনিবেদন' বলতে হয়তো ব্যক্তিগত উপস্থিত বোঝায়। 'কন্যোপায়ন দান' বলতে বোঝায় কন্যাদের উপঢৌকন হিসাবে দান এবং সম্রাটের সঙ্গে তাদের বিবাহ। তৃতীয় সংযুক্ত শব্দটির অর্থ দুইরকমভাবে করা যায়। এর একটি অর্থ হতে পারে গরুড় চিহ্নিত (গরুৎমদ্-অঙ্ক) গুপ্ত মুদ্রা ব্যবহারের এবং স্বীয় অঞ্চল শাসনের (স্ব-বিষয়-ভুক্তি) সনদ লাভের (শাসন যাচনা) জন্য দ্বিবিধ অনুরোধ। অন্য অর্থটি অপেক্ষাকৃত সরল। এই অর্থ অনুসারে এখানে স্বীয় অঞ্চলে শাসনাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে গরুড় প্রতীক চিহ্নিত সনদ লাভের জন্য অনুরোধের কথা বলা হয়েছে। হরিষেণ প্রশস্তির এই অংশে অত্যুক্তি আছে বলে মনে করা হয়। সেই অত্যুক্তির অংশ বাদ দিলে যা দাঁড়ায় তার অর্থ হল, বিদেশী শক-কুষাণ শাসকগণ এবং সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপ, সেবার শর্তে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন।

ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, শক-কুষাণ শাসকদের এই অধীন মনোভাব সমুদ্রগুপ্তের হাতে তাঁদের পরাজয়ের ফল, না পরাজয় এড়ানোর জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস, তা বলা যায় না। এই শাসকেরা সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে শুধুমাত্র জায়গীর হিসাবে তাঁদের রাজ্যগুলি শাসন করেছিলেন, একথা মেনে নিতে হলে নিশ্চিততর তথ্যের প্রয়োজন।

হরিষেণ প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'সিংহল' সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সিংহলের সঙ্গে উচ্চারিত "এবং অন্য সব দ্বীপ" কথাগুলির অর্থ খুবই অস্পষ্ট। সিংহলের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কের কথা, এই প্রশস্তি ভিন্ন ওয়াং-হিউয়েন-সির রচনা থেকেও জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় সিংহলী তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি মঠ ও বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্তের কাছে প্রচুর উপঢৌকন সহ একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। "অন্য সব দ্বীপ" প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, এখানে মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি হিন্দু উপনিবেশগুলির কথা বলা হয়েছে। ভারতীয়গণ এই অঞ্চলে গুপ্তযুগে, এমনকি তার আগেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এদের সংস্কৃতিতে গুপ্ত সংস্কৃতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট। মধ্য জাভায় গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারত ও এই উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ফা-হিয়েন লিখেছেন।

ডঃ গয়াল তৎকালীন ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপের সঙ্গে এই সম্পর্ককে দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, গুপ্ত-পূর্বযুগে এবং গুপ্তযুগের প্রথম দিকে ভারতের সঙ্গে সিংহলের এবং বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিংহল ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায়, এই মহাসাগরের উভয়দিকের সমুদ্রপথ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। ভারতের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায়, ভারতের পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশি। আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক কসমসের (ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে দ্রব্যসমূহ প্রথমে সিংহলে এবং পরে সেখান থেকে অন্যত্র যেত। সুতরাং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে সিংহল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর ভারতের বৃহত্তম বন্দর তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সিংহলের বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন। সে যুগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্যও কম ছিল না। মশলা, খনিজদ্রব্য, বিভিন্ন ধাতু, কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের জন্য এই দ্বীপপুঞ্জ বিখ্যাত ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। ৫০০ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক ইতিবৃত্ত সুংচু-তে বলা হয়েছে যে স্থলের ও সমুদ্রে সব দ্রব্যই ভারত থেকে আসত। ভারতীয় মসলীন চীনে বিশেষ পরিচিত ছিল। কাশ্মীরের জাফরাণ, বেশিরভাগ স্থলপথে হলেও, অংশত জলপথে ফু-নান হয়ে যেত। চৈনিক ইতিবৃত্তে ভারতের, বিশেষভাবে মগধের, গোলমরিচের চারার উল্লেখ আছে। ভারতীয়দের কাছে চীনের রেশমের (চিনাংশুকের) বিশেষ কদর ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য সমুদ্রগুপ্তের বৈদেশিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল।

অনেকে বলেন যে, সমুদ্রগুপ্ত হিন্দু রাজচক্রবর্তীত্বের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই যুদ্ধজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। বলা যায় যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর আদর্শ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। হরিষেণ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছার আভাস আছে, কিন্তু অনুষ্ঠানের উল্লেখ

নেই। তার পরবর্তী সম্রাটদের লেখতে এই অনুষ্ঠানের কথা আছে। সমুদ্রগুপ্ত এই যজ্ঞানুষ্ঠানের স্মৃতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে "অশ্বমেধ পরাক্রমঃ" এই যুগ্ম শব্দ সম্বলিত বিশেষ মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর পরবর্তী গুপ্ত শাসকের লেখতে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে 'চিরোৎসন্ন' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই শব্দটি হয়তো ভুল অর্থ করা হয়েছিল। তাই বলা হত যে, সমুদ্রগুপ্ত চির-উৎসন্ন, অর্থাৎ দীর্ঘকাল অপ্রচলিত এই যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা মৌর্যযুগের পর পুষ্যমিত্র, খারবেল, সাতকর্ণি প্রভৃতি বিভিন্ন সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। অধুনা 'চিরোৎসন্ন' শব্দের অন্য অর্থ দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে এর প্রকৃত অর্থ 'ব্যাপক'। সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত ব্যাপক আকারে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীকালের লেখতে এই কথাই বলা হয়েছে।

সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের রাজ্যগুলি জয় করে এবং অপরিচিত ও দুর্গম দক্ষিণাপথে অভিযান পরিচালনা করে তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সংগঠনেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশ তিনি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন। একমাত্র দক্ষিণ দিক বাদ দিয়ে বাকি তিন দিকে তিনি এই অঞ্চলকে কয়েকটি করদ রাজ্য দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। বলা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাঁচটি এবং পশ্চিম ভারতের নয়টি করদ রাজ্যের দ্বারা তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রথম রক্ষাব্যূহ রচনা করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বারোটি বিজিত রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ ছিল বলে মনে হয়। এই করদ রাজ্যগুলির পরে ছিল পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে শক-কুষাণগণের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপ। সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন এই রাজ্য ও দ্বীপগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ স্বরূপ ছিল। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু এই আদর্শের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু কৌটিল্যের নীতি অনুযায়ী তিনি সকলের উপর সমানভাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। সমুদ্রগুপ্ত এইভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একটি দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মনোনয়ন ছিল সমুদ্রগুপ্তের শেষ স্মরণীয় কাজ।

হরিষেণ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শুধু যোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি মানবিক গুণের আধার ছিলেন। 'মৃদু হৃদয়' সমুদ্রগুপ্তের মন অনুকম্পায় পূর্ণ ছিল। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শস্ত্রতত্ত্বে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি নিজে বহু কবিতাও রচনা করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। হরিষেণ তাঁকে এদিক থেকে বৃহস্পতি এবং নারদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা তাঁর সঙ্গীত রুচির নিদর্শন। শিল্পমণ্ডিত তাঁর সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তযুগের গৌরব। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গৌরব অশোকের সময় থেকে ম্লান হয়েছিল, সমুদ্রগুপ্তের সময় তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দুই প্রধান পুরুষ অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুই-ই চোখে পড়ে। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে এঁরা দুজনেই 'পরাক্রমে'র দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দুজনের কাছে পরাক্রমের অর্থ ছিল ভিন্ন। অশোক পরাক্রম বলতে যুদ্ধ বোঝেন নি, কার্যকরভাবে ভারতের 'পোরাণ পকিতি' এবং বুদ্ধের বাণী প্রচার বুঝিয়েছেন। সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাক্রমের অর্থ ছিল প্রবলভাবে যুদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। হরিষেণ ছাড়াও প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত

বসুবন্ধু তাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। অশোকের আদর্শ ছিল 'ধার্মিক ধর্মরাজত্ব', আর সমুদ্রগুপ্তের আদর্শ ছিল সনাতন 'রাজচক্রবর্তীত্ব'। উভয়েই ধর্মীবিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মবিজয় সম্পর্কে দুইজনের ধারণা এক ছিল না। অশোক ধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত তা করেন নি। তিনি 'ধর্ম' এবং 'বিজয়ের' মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। অশোক তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে তাঁর অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করেছিলেন। মানবিক এবং বিশ্বজনীনতার দিক থেকে অশোকের নীতি মহত্তর ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এর ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের দায়ভাগ আংশিকভাবে অশোককে বহন করতে হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সমুদ্রগুপ্তকে তা করতে হয় না। বরং বলা যায় যে, অনাগত যুগের প্রবল জড় ও চিন্ময় শক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক এবং এই যুগও অনেকাংশে তাঁরই সৃষ্টি। তিনি সাধারণভাবে 'পরাক্রম' এবং তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে 'বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত এবং অন্যান্য কয়েকজন গুপ্ত সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' অভিধা গ্রহণ করেন। এইভাবে গুপ্তযুগ বিক্রমাদিত্যদের যুগ নামে পরিচিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারত ইতিহাসে এই বিক্রমাদিত্য ঐতিহ্যের সূচনা করেছিলেন।

৪খ.২.৪ রামগুপ্ত

লেখ প্রমাণ অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন। কিন্তু কিছুকাল আগে বিশাখাদত্ত রচিত *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* নাটকের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এ বিষয়ে নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। বিশাখাদত্ত এই নাটকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীকালে *হর্ষচরিত* এবং *কাব্য মীমাংসা*-এ তাঁর সমর্থন মেলে। এই কাহিনী অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের পরে রামগুপ্ত সম্রাট হন। তাঁরগ রাণী ছিলেন ধ্রুবদেবী। রামগুপ্ত জনৈক শকরাজের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বড় ভাই রামগুপ্তকে হত্যা করে, তাঁর বিধবা পত্নী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। গুপ্তযুগের লেখতে এই বিবাহের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

এতদিন রামগুপ্তের কোন লেখ পাওয়া যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি বিদিশার কাছে একাধিক লেখ পাওয়া গেছে। রামগুপ্তের এই লেখগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি লেখ এবং সাঁচি লেখর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই লেখতে "মহারাজাধিরাজ" রামগুপ্তের নামোল্লেখ আছে। সুতরাং দীর্ঘকাল ইতিহাসের উপেক্ষিত রামগুপ্তের অস্তিত্ব এখন প্রায় প্রমাণিত বলা চলে। তবে তিনি কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, তা বলা যায় না।

৪খ.২.৫ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের পরে প্রায় ৭৫ বৎসরের জন্য গুপ্ত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং প্রথম কুমারগুপ্ত তাঁদের যা কিছু সামরিক সাফল্য, তা এই অঞ্চলেই লাভ করেছিলেন। তাঁদের সময় পশ্চিম মালবের উজ্জয়িনী প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সংহতি ও সম্প্রসারণ দুই-ই সাধিত হয়েছিল। তাঁর সময় সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কামরূপের রাজা সমুদ্রবর্মন (আনু. ৩৮০-৪০৫ খ্রিস্টাব্দ), বলবর্মন (আনু. ৪০৫-৪২০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিমে এই সাম্রাজ্য যমুনা পরবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। মথুরায়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দুইটি লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং মথুরা অবশ্যই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি মথুরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন, অথবা নতুন জয় করেছিলেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় ছিল। ডঃ গয়াল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, তিনি মথুরা পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কেননা সমুদ্রগুপ্ত মথুরা ও পদ্মাবতীর নাগবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই অঞ্চলে কোন সামরিক সাফল্য লাভ করেছিলেন, তাঁর কোন লেখতে তার প্রমাণ নেই। মথুরার পশ্চিমে যে উপজাতি রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্য ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল। বায়ানার ভাণ্ডারে প্রাপ্ত ১৮২১টি স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ৯৮৩টি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের। এ থেকে স্পষ্ট যে, এই অঞ্চলে তাঁর সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবে তাঁর তাম্রমুদ্রা থেকে একই অনুমান করা চলে। মধ্য পাঞ্জাবের শক শাসকগণও হয়তো তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে প্রমাণ ততটা জোরালো নয়। ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বহির্ভারতের হিন্দু উপনিবেশগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মধ্য জাভায় প্রাপ্ত তাঁর স্বর্ণমুদ্রা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল প্রধানত পশ্চিমে। এখানে ভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও আচার বিশিষ্ট শকদের উপস্থিতি অবশ্যই তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল। আয়তনের দিক থেকে তখন শকরাজ্য ছোট হয়ে গেলেও, এর দুষ্কার্যের ক্ষমতা খুব কম ছিল না। সম্ভবত রামগুপ্তের রাজত্বকালে শকগণ পূর্ব মালব আক্রমণ করেছিল। তাই শকদের উচ্ছেদ সাধনের ইচ্ছা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তিনি হয়তো পশ্চিম ভারতের শকদের উচ্ছেদ করে সমুদ্রগুপ্তের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করে সুরাষ্ট্র এবং গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধুমাত্র সীমান্ত সম্প্রসারণ তাঁর এই কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জানতেন না, এর ফলে তিনি পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে সরাসরি প্রবেশ অধিকার লাভ করবেন এবং এইভাবে ভারতের পশ্চিম দিকের সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

পশ্চিম ভারতে তখন বৃহত্তম বন্দর ছিল বারিগাজা (ব্রোচ)। শুধু ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদিই নয়, মধ্য এশিয়া এবং চীন থেকে যেসব পণ্য ভারতে আসত, তাও এই বন্দরের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। অনেকে মনে করেন যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল। তাঁরা বলেন যে ভারতীয় রেশম শিল্পীদের তৎকালীন আর্থিক বিপর্যয়ের আভাস কুমারগুপ্তের মান্দাসোর লেখতে পাওয়া যায়। এই লেখতে বলা হয়েছে যে, রেশম শিল্পীদের একটি 'গিল্ড' লাট বিষয় (গুজরাট) থেকে পশ্চিম মালবের দাসপুরে চলে এসেছিল। তাদের এই অভিপ্রয়াণ দাসপুরে সূর্য মন্দির স্থাপনের, অর্থাৎ ৪৩৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঘটেছিল। তাঁরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যের অবনতি দেশের অভ্যন্তরে এই অভিপ্রয়াণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভিসিগথ নেতা আলারিকের আঘাতে তখন রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। লাটের রেশমশিল্পীদের দুর্ভাগ্য তাই রোমের দুর্দিনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ডঃ গয়াল এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সত্য বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, এমন অনেক তথ্য আছে যার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, গুপ্তযুগে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের বিশেষ কোন হেরফের হয়নি এবং ভারতীয় বণিকদের লাভের পরিমাণ যদি কমে থাকে, তবে তা নামমাত্র। ৪০৮ খ্রিস্টাব্দে আলারিক রোম

আক্রমণ থেকে বিরত হন, কিন্তু মুক্তিপণ হিসাবে তিনি ৩০০০ পাউন্ড গোলমরিচ এবং ৪০০০ রেশমের পোশাক দাবি করেন। তাঁর এই দাবি মেটানো হয়েছিল। এ থেকে কী বিরাট পরিমাণ প্রাচ্য দ্রব্য রোমে মজুত থাকত, তা বোঝা যায়। তাছাড়া রোমের অবনতির অল্পকাল পরেই রোমের স্থান গ্রহণ করেছিল কনস্ট্যান্টিনোপল বা বাইজানসিয়াম। এই শহরের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ধনী ও বিলাসী ছিলেন। তাঁদের কাছে প্রাচ্যের দ্রব্যসমূহের বিশেষ চাহিদা ছিল। রাজসভায় এবং গির্জায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ধূপ শুধু ভারতীয় এবং আরব বাণিজ্যের মাধ্যমে পাওয়া যেত। বাইজানসিয়ামের চিকিৎসা সংক্রান্তের গ্রন্থের লেখকেরা, সবরকম ভারতীয় মশলা সেখানে পাওয়া যায়, এটা ধরে নিয়ে তাঁদের বই লিখেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের (৫২৭-৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ) আইনের সার সঙ্কলনে বাণিজ্য শুল্ক সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রসঙ্গে আমদানি পণ্যের ক'টি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় এমন অনেক পণ্যের নাম আছে, যেগুলি বিশেষভাবে ভারতীয়। বাইজানসিয়ামের অনেক মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া গেছে। তাছাড়া রোমান এবং বাইজানটাইনগণই ভারতীয় পণ্যের একমাত্র ক্রেতা ছিলেন না। প্রোকোপিয়াস লিখেছেন যে রেশমের একচেটিয়া বাণিজ্য তখন পারস্যের হাতে ছিল এবং পারস্য এই রেশম ভারত থেকে কিনত। জাস্টিনিয়ান ইথিওপিয়ার রাজা হেলেস্থিয়াসের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে ইথিওপিয়ার ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে রেশম কিনে রোমকে বিক্রয় করে। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ প্রথম যে বন্দরে নোঙর করত, পারসিক বণিকেরা সেখানে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে রোমের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিত। এইভাবে পশ্চিমে পৌঁছুবার আগেই তারা ভারতীয় জাহাজের সব মাল কিনে নিত। সুতরাং গুপ্তযুগে রেশমশিল্পীরা বিপন্ন হয়েছিল; এ ধারণা হয়তো ঠিক নয়। ডঃ গয়াল মনে করেন যে লাট থেকে রেশমশিল্পীদের মালবের অভ্যন্তরে দাসপুরে অভিপ্রয়াণ অন্য কারণেও হতে পারে। তখনকার শান্তি ও সমৃদ্ধি, বিশেষত দাসপুরের মতো শহরের উচ্চশ্রেণীর মানুষের ক্রমবর্ধমান বিলাসব্যসন হয়তো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে একই রকম আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাই লাটের কিছুসংখ্যক উৎসাহী রেশমশিল্পী এই অভিপ্রয়াণে যোগ দিয়েছিলেন।

ডঃ মজুমদার লিখেছিলেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি। সমুদ্রগুপ্ত এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু শকরা তখনও শক্তিশালী ছিলেন। মাত্র অল্পকালের জন্য বকাটকগণ তাঁদের খর্ব করতে পেরেছিলেন। ডঃ গয়াল শকদের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে ডঃ মজুমদারের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শকদের তখন কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিও বলা চলে না। শকক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসেন (৩৪৮-৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে মালব ও রাজস্থানের উপর তাঁর অধিকার হারিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকটি সীসার মুদ্রা ছাড়া ৩৫১-৩৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার মুদ্রা প্রচলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর রাজত্বকালে সাধারণ মানুষ তাদের সম্পদ, নিরাপত্তার জন্য মাটির তলায় পুঁতে রাখত। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি হয়তো রামগুপ্তের উত্থানের সুযোগ নিয়ে তাঁর অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামগুপ্তের হত্যা এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে শকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। তাঁর পরে সিংহসেন এবং সিংহসেনের পরে চতুর্থ রুদ্রসেন ক্ষমতালাভ করেন। ৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে শক শাসক ছিলেন জনৈক সত্যসিংহের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন। প্রচলিত ধারণা অনুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। এইভাবে তিনি শতাব্দীরও বেশি কালব্যাপী মালব-গুজরাট-সৌরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রপ শাসনের অবসান ঘটে।

ডঃ গুপ্ত এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করেছেন। ক্ষত্রপদের তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তথাকথিত সাময়িক অভিযান কোনমতেই পশ্চিমের ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে হতে পারে না। এই ক্ষত্রপদের রৌপ্য মুদ্রার তিনটি ভাণ্ডার সর্বনিয়া, সাঁচি এবং গণ্ডারমৌতে পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলি থেকে জানা যায় যে ৩৫১ খ্রিস্টাব্দে বা তার অল্পকাল পরে রাজস্থান এবং মালবে ক্ষত্রপদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তখন সিংহাসন থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তার আভাস হয়তো সমকালীন কয়েকটি লেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভিলসার নিকটবর্তী উদয়গিরি গুহালেখ'র কথা প্রথমেই বলা চলে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সন্ধিবিগ্রহিক বীরসেন এই গুহাটি শম্ভুকে দান করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে বীরসেন তাঁর প্রভুর সঙ্গে উদয়গিরিতে তখন গিয়েছিলেন, যখন তিনি (অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) "পৃথিবীর জয়ের চেষ্টায় রত ছিলেন।" সাধারণভাবে মনে করা যায় যে, এই লেখতে শকদের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে। এই লেখতে কোন তারিখ না থাকায় সেই যুদ্ধের তারিখ এ থেকে জানা যায় না। ডঃ গুপ্ত লেখর সামরিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এমনও হতে পারে যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে, এই অঞ্চলে তাঁর কন্যা প্রভাবতীদেবীর (বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিধবা পত্নী) সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

সাঁচিতে আরও একটি লেখ পাওয়া গেছে, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। এই লেখতে সম্রাটের সেনাপতি আম্রকার্দব কর্তৃক সাঁচির বৌদ্ধ বিহারে দানের কথা আছে। সেনাপতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি "অনেক যুদ্ধ- জয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন"। এই লেখ'র তারিখ ৪১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে এই সেনাপতি শকদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনে সাঁচিতে গিয়েছিলেন। উদয়পুরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় একটি লেখও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর তারিখ ৪০১-২ খ্রিস্টাব্দ। এতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্ত, একজন সোনাকানিক মহারাজার দানের উল্লেখ আছে।

ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভের প্রমাণ মুদ্রায় পাওয়া যায়। পশ্চিমের শকক্ষত্রপগণ দীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে তাদের মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এই মুদ্রাগুলি তাঁদের তিন শতাব্দীরও বেশি কালব্যাপী শাসনের স্মারক। কিন্তু ৩৮৮-৩৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁদের এই মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মুদ্রার পরিবর্তে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তখন শক মুদ্রার অনুকরণে তাঁর মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রপ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাঁদের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। ডঃ মজুমদার উপরোক্ত তিনটি লেখর সামরিক তাৎপর্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব মালবের একই স্থানে, একের পর এক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত, মন্ত্রী এবং সেনাপতির উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, শকদের বিরুদ্ধে সম্রাটের যুদ্ধ 'দীর্ঘস্থায়ী' হয়েছিল। শক মুদ্রার অনুকরণে তিনি যে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, তার সম্ভাব্য তারিখ ৪০৯-৪১৫ খ্রিস্টাব্দে। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দশকে শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অভিযান পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং সমাপ্ত হয়েছিল।

ডঃ গুপ্ত সোনাকানিক মহারাজার উদয়গিরি লেখ-র এবং আম্রকার্দবের সাঁচি লেখর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী প্রভাবতী নাবালক

পুত্রের হয়ে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর লেখতে গুপ্ত সম্রাটদের বংশতালিকা পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সময় বকাটক শাসনব্যবস্থার উপর গুপ্তদের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যার সাহায্যার্থে পাটলিপুত্র থেকে কয়েকজন রাজকর্মচারী বকাটকে পাঠিয়েছিলেন। উদয়গিরি লেখ এবং সাঁচি লেখ এই সময়ের। প্রচলিত ধারণা অনুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করে কাথিয়াবাড় এবং উত্তর গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য এইভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের বেশিরভাগ এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের সংযোগ নিকটতর হয়েছিল। দেশের ভিতরে বাণিজ্য শুল্কের বাধা দূরীভূত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উজ্জয়িনীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যত এই নগরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে প্রধান ঐতিহাসিক উপকরণ দিল্লী সংলগ্ন কুতুবমিনারের নিকটস্থ মেহেরাউলি গ্রামে প্রাপ্ত একটি লৌহস্তম্ভ লেখ। এই লেখতে কোন তারিখ নেই। এতে 'চন্দ্র' নামে একজন রাজার উল্লেখ আছে, যিনি বঙ্গের শত্রুদের মিলিতভাবে পরাজিত করেছিলেন, এবং সপ্তসিন্ধু পার হয়ে বহ্লীকদের পরাজিত করেছিলেন। এখানে বহ্লীক বলতে হিন্দুকুশ পরবর্তী ব্যাকট্রিয়া বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। যাঁরা এই লেখর 'চন্দ্র' এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি মনে করেন, তাঁরাও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অতদূর অগ্রসর হননি। কিন্তু তবুও এই লেখ যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কিত তা মেনে নিতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি, কেননা এই লেখতে 'বহ্লীক' শব্দটির সঙ্গে 'সিন্ধো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'বহ্লীক' বলতে সিন্ধুনদ এলাকা বোঝানো হয়েছে। আর পাঞ্জাব বা তার বেশিরভাগ অংশকে যে বহ্লীক বলা হত, মহাভারত থেকে তা জানা যায়। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই বহ্লীক দেশ নিম্ন সিন্ধুর পশ্চিমে, বোধহয় বেলুচিস্তান অঞ্চলে ছিল। 'বঙ্গ' সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য এই যে, এই অঞ্চল নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করেছিল এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

একমাত্র শকরাজ্য জয় করা ভিন্ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর রাজত্বকালের অন্য কোন রাজনৈতিক ঘটনা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর সময়ে স্থাপিত কয়েকটি বিবাহ-সম্পর্ক রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি নাগবংশের কন্যা কুবেরনাগাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের কন্যা প্রভাবতীকে বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন। কুন্তলের (বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া অঞ্চল) কদম্ব বংশীয় রাজা কাকুস্থবর্মনের একটি লেখ জানা থেকে যায়, তিনি তাঁর কন্যাদের গুপ্তরাজাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে তিনি তাঁর একটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়, না তাঁর পরবর্তী শাসকের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। তবে এই বিবাহ গুপ্তনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এইমাত্র বলা যায়। একথাও সত্য যে বকাটক-গুপ্ত মৈত্রীর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য অভাবিতভাবে লাভবান হয়েছিল। প্রভাবতী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি যুগপৎ প্রথম পৃথিবীসেন এবং তাঁর স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর বকাটক রাজ্যের শাসনভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে বকাটক রাজ্যে গুপ্তদের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যু প্রভাবতীর কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি হলেও, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে তা পরম লাভজনক হয়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হরিষেণের মতো কোন প্রশস্তি রচয়িতা ছিল না। তবে বিভিন্ন মুদ্রা থেকে তাঁর শারীরিক শক্তি, মানসিক উৎকর্ষ, শিল্পরুচি এবং ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি 'সিংহ বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। দুটি কারণে এই অভিধাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়। এই অভিধা নিশ্চিতভাবে তাঁর সাহস ও শৌর্যের পরিচায়ক। অনেকে বলেন যে, ব্যাঘ্রের পরিবর্তে সিংহের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এ হয়তো সিংহ অধ্যুষিত গুজরাট জয়ের স্মারক। তাঁর কোন কোন মুদ্রায় 'রূপকৃতি' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, এই শব্দটি তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক উৎকর্ষ এবং উন্নত রুচিবোধের পরিচায়ক। কোন কোন মুদ্রায় কর্মব্যস্ত সম্রাটের শান্ত পারিবারিক জীবনের চিত্র বিধৃত। এখানে দেখা যায় যে, রাজা এবং রানী একাসনে বসে আছেন।

কোন কোন মুদ্রায় দেখা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রম' এবং 'বিক্রমাঙ্কে'র সঙ্গে 'বিক্রমাদিত্য' অভিধা গ্রহণ করেছেন। এই শেষের অভিধাটি আবার আলোচনার বিষয় হয়েছে। অনেকে তাঁকে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে ভেবেছেন। লোক-কাহিনীর এই বিক্রমাদিত্য ছিলেন একজন 'শকারী', উজ্জয়িনী অধিবাসী, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ অব্দের বিক্রমাব্দের প্রবর্তনক এবং অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক। আপাতদৃষ্টিতে লোককাহিনীর এই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক সাদৃশ্য আছে। তিনি শকদের জয় করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন কোন দলিলে তাঁকে 'উজ্জয়িনী এবং পাটলীপুত্রের রাজা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, যে তিনি ছিলেন গুপ্তাব্দের প্রবর্তক। এবং তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 'নবরত্ন সভার' পৃষ্ঠপোষক। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্য ছিলেন, না লোক-কাহিনীর নায়কের অনুসরণে তিনি বিক্রমাদিত্য অভিধা গ্রহণ করেছিলেন, বলা কঠিন। এই দুইয়ের যেকোন একটি সম্ভাবনা সত্য হতে পারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্য না হলেও, হয়তো এই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে জড়িত কিছু ঐতিহ্যের উৎস ছিলেন তিনি-ই। এমন হতে পারে যে মধ্যযুগের সূচনা যখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রায় বিস্মৃত, তখন তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনীর সম্পর্ক এবং তাঁর গুপ্তাব্দের প্রবর্তন, মালবের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, উজ্জয়িনীর রাজা এই বিক্রমাদিত্যই তাদের অতিপ্রিয় মালব অব্দের (অর্থাৎ বিক্রমাব্দের) প্রবর্তক। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, কৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। কিন্তু তাই বলে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ঐতিহাসিক পুরুষ বিক্রমাদিত্যই ঐতিহ্যের উৎস, তাহলে তা অত্যুক্তি হবে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রথাগত ধারণার অভিব্যক্তি ডঃ মজুমদারের বক্তব্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যজয় আরম্ভ করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সেই রাজ্যজয় সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটি সুসংগঠিত সাম্রাজ্যের মধ্যে উপজাতি রাজ্য, সীমান্ত রাজ্য, এমনকি বিদেশী শক কুষাণদের অঙ্গীভূত করার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। একটি শান্তিপূর্ণ সুসংহত সাম্রাজ্য তিনি তাঁর পুত্রের মহৎ উত্তরাধিকার রূপে রেখে গিয়েছিলেন। দূর ভবিষ্যতে সমুদ্রগুপ্তের স্মৃতি প্রায় মুছে গিয়েছিল, কিন্তু কৃতজ্ঞ উত্তরপুরুষ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বহু যুদ্ধ-উত্তীর্ণ সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন

ইতিহাসের বীর নায়ক। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দ্বারা চিহ্নিত নতুন যুগের পুরোধা। তাই তাঁর স্থান হয়েছিল অসংখ্য মানুষের অন্তরে।

কিংবদন্তী অনুসারে বরাহমিহির এবং কালিদাস উভয়েই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন সভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালের আলোচনায় মনে হয়েছে যে বরাহমিহির কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন না। তিনি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্যভট্টের পরবর্তী ছিলেন। কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসের সমকালীন অথচ কালিদাস বিরোধী দিগনাগাচার্যের উল্লেখ করেছেন। এই দিগনাগ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং কালিদাসও তাই ছিলেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে ঈষৎ পরিবর্তিত ধারণার সূচনা হয়েছে। অনেকের মতে তিনি হয়ত সমুদ্রগুপ্তেরও সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাস তাঁর *রঘুবংশম্*-এ সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যকে ভিত্তি করে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ জয়ের কোন উল্লেখ নেই। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সুতরাং *রঘুবংশম্* এই ঘটনার পূর্ববর্তী রচনা। আনুমানিক ৪০০ খিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল মনে করা হয়। এই গ্রন্থটি কালিদাসের বিশেষ পরিণত সৃষ্টি। এর আগে নিশ্চয়ই তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ছিল। সুতরাং তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন বলা চলে। তা যদি হয়, তাহলে তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন। একথা এখন মোটামুটি স্বীকৃত যে, বিক্রমাদিত্যকাহিনী কেবল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নয়, সমুদ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল। এমন হতে পারে যে, কালিদাস, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উভয়েরই রাজসভায় উপস্থিত থাকায় জনমানসে দুই জন সম্রাটের কৃতিত্ব মিশে গিয়ে বিক্রমাদিত্য ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল।

৪খ.২.৬ পরবর্তী গুপ্তরাজগণ প্রথম কুমারগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শেষ নিশ্চিত তারিখ ৪১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ এবং প্রথম কুমারগুপ্তের প্রথম নিশ্চিত তারিখ ৪১৫-১৬ খিস্টাব্দ। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলিতে তাঁর রাজত্বকালের সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। তবে এই লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তাঁর মুদ্রা থেকে একথা বলা যায় যে, তাঁর সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য অটুট ছিল। তিনি নতুন ধরনের স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এই মুদ্রাগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রৌপ্যমুদ্রার প্রবর্তনও তিনিই প্রথম করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রার একটি বৃহৎ ভাণ্ডার বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সাতরা জেলার সামন্দ নামক স্থানে পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাঁর ১৩টি মুদ্রা বেরারের অন্তর্গত এলিচপুরে পাওয়া গেছে। অনেকে এই মুদ্রাগুলিকে এই অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তারের ইঙ্গিত বলে মনে করেন। তবে শুধু এই মুদ্রাগুলির উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। আবার অনেকে বলেন যে এই মুদ্রাগুলি থেকে, তিনি যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তা বলা যায়। প্রথম কুমারগুপ্ত 'ব্যাঘ্র-বল-পরাক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিধা থেকে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, তিনি হয়তো নর্মদা পরবর্তী ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি আক্রমণ করেছিলেন। তবে তাঁর মতে, এই অভিযান বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে উদ্ধার করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের দাক্ষিণাত্যে সফল অভিযানের ফলে হয়তো উত্তর দাক্ষিণাত্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু তা হতে পারেনি, যেহেতু তাঁর রাজত্বের শেষ দিক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য একের এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল পুষ্যমিত্রদের এবং হূণদের আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে গুপ্তগণ শুধু যে দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ফসল ঘরে তুলতে পারেন নি তাই নয়, তাঁদের সম্প্রসার চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত অল্পদিনের জন্য সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তখন থেকেই এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণাত্মক নয়, আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

এলাহাবাদ জেলায়, যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে মানকুওয়ার গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তির উপর প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ের একটি লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখতে তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ' না বলে, 'মহারাজা' বলা হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, প্রথম কুমারগুপ্ত হয়তো তাঁর সার্বভৌম অধিকার হারিয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত লেখ এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এই লেখতে প্রথম কুমারগুপ্তকে 'পৃথিবীপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় একটি চৈনিক গ্রন্থ এবং একশ্রেণীর গুপ্ত মুদ্রার ভিত্তিতে অনুমান করেন যে কুমারগুপ্তের সময় কামরূপ হয়তো গুপ্তদের বশ্যতা অথবা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিল।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার দিক থেকে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং এই প্রসঙ্গে প্রথম দামোদরপুর লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৪ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই লেখতে বলা হয়েছে যে, একজন ব্রাহ্মণ তিন দিনার মূল্যে এক কুল্যবাপ পতিত জমি কিনতে চেয়ে স্থায়ী দানপত্রের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ককরতে পারেন। জমির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। কোটিবর্ষ বিষয়ের স্থানীয় প্রশাসন এই আবেদন মঞ্জুর করেন। এই কোটিবর্ষ বিষয়টি ছিল কুমারামাত্য বেত্রবর্মনের শাসনাধীন এবং বেত্রবর্মন ছিলেন পণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিক (প্রদেশপাল) চিত্রদত্তের অধীন। এই লেখতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ও বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত কর্মচারীপদের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের নিকটস্থ কর্মদণ্ড গ্রামে প্রাপ্ত লেখর রচনাকাল ১১৭ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৪৩৭ খ্রিস্টাব্দ। এই কর্মদণ্ড লিঙ্গ লেখ থেকে জানা যায় যে প্রথম কুমারগুপ্তের কুমারামাত্য এবং মহাবলাধিকৃত (সেনাপতি) পৃথিবীসেন অযোধ্যায় কয়েকজন ব্রাহ্মণদের জন্য দানকার্য করেন। এই লেখগুলি থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, এরাণ এবং হয়তো অযোধ্যা, এই তিনটি প্রদেশের শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মদণ্ড লেখতে যে পৃথিবীসেনের কথা বলা হয়েছে, তিনি আগে কুমারামাত্য ছিলেন এবং পরে মহাবলাধিকৃত হয়েছিলেন, না কিংবা সঙ্গে দুইটি পদে নিযুক্ত ছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। প্রথম অনুমান সত্য হলে গুপ্তযুগে অসামরিক কর্মচারী পরে সামরিক পদে নিযুক্ত হতে পারতেন। আর দ্বিতীয় অনুমান সত্য হলে বলা যায় যে তখন একই ব্যক্তি সামরিক এবং অসামরিক উভয় প্রকার দায়িত্ব যুগপৎ পালন করতে পারতেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক কার্যের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাঁর সময়ের বিভিন্ন লেখতে তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯৬ গুপ্তাব্দের (৪১৬ খ্রিস্টাব্দ) বিলসর লেখতে মহাসেন কার্তিকেয়ের মন্দিরে স্তম্ভ নির্মাণের কথা আছে। তৃতীয় উদয়গিরি গুহালেখতে (গুপ্তাব্দ ১০৬, ৪২৬ খ্রিস্টাব্দ) জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ১১৩ গুপ্তাব্দের (৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ) মথুরা

লেখতে জনৈক মহিলা কর্তৃক জৈন মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। মান্দাসোর লেখতে সূর্যমন্দির নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার অন্তর্গত বৈগ্রাম গ্রামে প্রাপ্ত ১২৮ গুপ্তাব্দের (৪৪৮ খিস্টাব্দ) একটি লেখতে ভগবান গোবিন্দস্বামীর মন্দিরে ফুল এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের জন্য এবং ঐ মন্দির মেরামতের জন্য, দুইজন ব্যক্তিকে জমি বিক্রয়ের কথা আছে। বিভিন্ন দেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণের যে কাহিনী বিভিন্ন লেখতে ইতস্তত পাওয়া যায়, তা থেকে অনায়াসে বলা চলে যে, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রথম কুমারগুপ্ত পরম সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের সময় জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সত্রের উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বিলসর লেখতে সত্র প্রতিষ্ঠার কথা আছে। গধোয়া লেখতে (এলাহাবাদ) একটি সত্রের জন্য ১২ দিনার দানের উল্লেখ আছে।

কর্মদণ্ড লেখতেও ব্রাহ্মণদের জন্য দানের কথা পাওয়া যায়। দামোদরপুরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় লেখতে (রচনাকাল ১২৮ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ) পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর রাজত্বকালে ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ্রাস পায় না। বরং বলা যায় যে ইতিপূর্বে সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে তার পরিণত ফল পাওয়া গিয়েছিল। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ডাঃ মজুমদার উভয়েই বলেছেন যে চূড়ান্ত অবনতি শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁর রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল।

৪খ.২.৭ ঘটোৎকচগুপ্ত ও সম্ভাব্য ভ্রাতৃবিরোধ

প্রথম কুমারগুপ্তের অব্যবহিত পরের ইতিহাস ঈষৎ অনিশ্চিত। এ বিষয়ে এতদিন দুইটি ধারণা প্রচলিত ছিল। একটি ধারণা অনুসারে প্রথম কুমারগুপ্তের পরে তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে কুমারগুপ্তের পরে সিংহাসনের জন্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ শুরু হয়েছিল এবং এই বিরোধ স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার পুরুগুপ্তকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছিলেন।

৪খ.২.৮ স্কন্দগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত বারো বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রাজত্বকালের জন্য আমাদের প্রধানত দুটি লেখর উপর নির্ভর করতে হয়। একটি ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুনাগড়ে শিলালেখ, অন্যটি তারিখবিহীন ভিতারি স্তম্ভ লেখ।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, প্রথম কুমরগুপ্ত যখন মারা যান তখন স্কন্দগুপ্ত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি কীভাবে সিংহাসন লাভ করেন তা যেমন অনিশ্চিত, তেমনই তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকের ঘটনাবলী সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। ভিতারি স্তম্ভ লেখর চতুর্থ স্তবকে আছে যে, তিনি পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেছিলেন, অষ্টম স্তবকে আছে যে, তিনি হূণদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। জুনাগড়ে শিলালেখ'র দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, বৈরী রাজারা তাঁর বিরুদ্ধে সাপের মতো ফণা উদ্যত করেছিলেন, কিন্তু তিনি গরুড়ের মতো স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহায়তায় তাঁদের দমন করেন। এই লেখরই তৃতীয় পংক্তিতে যাঁরা তাঁর কাছে মাথা হেঁট করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে "ম্লেচ্ছদেশের শত্রুদের" কথা

বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এখানে "ম্লেচ্ছ" বলতে হূণদের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ভিতারি স্তম্ভলেখতে হূণদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে, এখানে 'ম্লেচ্ছ' বলতে কিদার কুষাণদের কথা বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বকাটকগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পুষ্যমিত্রগণ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করে সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করেন। তবে তিনি যুবরাজ হিসাবে, না তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তা বলা যায় না। জুনাগড় শিলালেখতে তিনি উদ্যত ফণা সাপের মতো শত্রু এবং প্রতিষেধক গরুড় বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। অনেকে মনে করেন যে এখানে পশ্চিম মালবের বিদ্রোহী বর্মণ বংশীয়দের, আক্রমণকারী বকাটক এবং তাদের সমর্থকগণকে বোঝানো হয়েছে, এবং 'গরুড়' বলতে অন্তত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুহৃদ, দাসপুরের শাসক প্রভাকরকে বোঝানো হয়েছে। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বর্মণগণ স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হন, কিন্তু প্রভাকর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁকে দাসপুরের নতুন প্রদেশপাল নিযুক্ত করা হয়েছিল।

হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা স্কন্দগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিবেচিত হয়। ভিতারি স্তম্ভলেখতে কোন তারিখ না থাকায় এই হূণ আক্রমণ ঠিক কখন হয়েছিল, বলা কঠিন। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে গুপ্তদের নীতির দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ কোনদিনই এই অঞ্চল সম্পর্কে বলিষ্ঠ কোন নীতি গ্রহণ করেননি। মেহেরাউলি স্তম্ভলেখ অনুযায়ী 'চন্দ্র' সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে বহ্লীকদের আক্রমণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু এই অঞ্চলে স্থায়ী অধিকার স্থাপন এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। অবশিষ্ট ভারতের উপর তাঁদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে পাঞ্জাব এবং খাইবার গিরিপথের উপর নিয়ন্ত্রণ যে একান্ত প্রয়োজন, তাঁরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। এ দিক থেকে গুপ্তগণ মৌর্যগণের তুলনায় রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি পাঞ্জাব ও খাইবার গিরিপথ সুরক্ষিত রাখতে পারতেন, তাহলে হূণদেরদ সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ মালব এবং মধ্যভারতে অনুষ্ঠিত না হয়ে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে অনুষ্ঠিত হত। এই অঞ্চলে সামরিক গুরুত্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যুক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যপথগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও গুপ্তগণ এই অঞ্চলে তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারেননি, কেননা ভৌগোলিক বাধা ছিল খুব প্রবল। গঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকা যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দ্বারা যুক্ত (বর্তমান থানেশ্বর-দিল্লি-কুরুক্ষেত্র ভূভাগ), সেই ভূভাগ অরণ্যসঙ্কুল ও দুর্গম ছিল। তাই গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন শক্তির পক্ষে সিন্ধু উপত্যকা জয় করা সহজ ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্তদের উত্তর-পশ্চিম ভারত নীতি বোঝা যায়, কিন্তু তাকে সমর্থন করা যায় না।

তৎকালীন হূণ নেতা আটিলা দানিউব নদের তীর থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকার্য চালিয়েছিলেন, একথা মনে রাখলে হূণদেরদ বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সাফল্যের তাৎপর্য পরিমাপ করা সহজ হয়। হূণদের পরাজিত করে তিনি সঙ্গতভাবেই 'বিক্রমাদিত্য' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাপক হূণ আক্রমণের সম্মুখীন তখন ভারতকে হতে হয়নি। প্রথমত, ভারত হূণদের প্রধান আক্রমণ পথ থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে পর্বতমালার দুস্তর

বাধা ছিল। এই বাধা অতিক্রম করে হূণদের যে শাখা ভারত আক্রমণ করেছিল, ভারতে পৌঁছে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণকারী হূণদের যদি সমুদ্র বলা যায়, তাহলে ভারতে আক্রমণকারী হূণরা ছিল সেই সমুদ্রের একটি তরঙ্গ মাত্র। পারস্য আক্রমণকারীদের কাছে পথ যতটা উন্মুক্ত ছিল, পর্বতমালার কল্যাণে ভারত তা ছিল না। তাই পারস্য সম্রাট ফিরোজ হূণদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, আর গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করেছিলেন। তার পরে ৫০ বৎসর আর হূণ আক্রমণ হয়নি। এ থেকে তাঁর সাফল্যের পরিমাপ করা যায়।

একদা মনে করা হত যে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণরা বারবার ভারত আক্রমণ করেছিল। এই অনুমানের ভিত্তি ছিল স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার ভারি ওজন। মনে করা হত যে, বারংবার আক্রমণজনিত বিপর্যয়ের জন্য স্কন্দগুপ্তের মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেশি হয়েছিল। এখন এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে, কেননা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্কন্দগুপ্তের মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেশি ছিল না। বরং সোনার পরিমাণ বেশি ছিল।

স্কন্দগুপ্ত কেবল যুদ্ধেই নয়, সাম্রাজ্য শাসনেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জুনাগড় শিলালেখর ষষ্ঠ পংক্তিতে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আবশ্যিক গুণাবলীর যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে তিনি জনগণের কল্যাণ সাধন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায়। সুরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের সংস্কার তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জুনাগড় লেখতে বৃষ্টির জলে কীভাবে এই হ্রদটি বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং সুরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্ণদত্ত কীভাবে তাঁর পুত্র, স্থানীয় প্রশাসক চক্রপালিতের সাহায্যে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ১০০ হাত লম্বা, ৬৮ হাত চওড়া, এবং সাতমানুষ সমান উঁচু বাঁধ সেখানে নির্মাণ করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে সক্রাদিত্য (স্কন্দগুপ্তের অন্যতম অভিধা) নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তা যদি হয়, তাহলে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। চীনের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের জীবনের শেষ দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শাসনকার্যে তিনি কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সুরাষ্ট্রের প্রদেশপাল পর্ণদত্ত, তাঁর পুত্র চক্রপালিত, অন্তর্বেদীর (গাঙ্গেয় দোয়াবের) বিষয়পতি সর্বনাগ এবং কোশলের শাসন ভীমবর্মণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে ভাগবত, অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিষ্ণুর উপাসক হওয়া সত্ত্বেও অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন নি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার অন্তর্গত কাহাষম নামক স্থানে প্রাপ্ত স্তম্ভলেখতে মদ্র নামক একজন ব্যক্তি কর্তৃক ১৪১ গুপ্তাব্দে (৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) পাঁচজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিসহ একটি স্তম্ভ স্থাপনের কথা আছে।

পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে স্কন্দগুপ্তের সময়েও মধ্যভারত এবং সুরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বল অংশরূপে বিবেচিত হত। স্কন্দগুপ্ত বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমতম অংশকে ভবিষ্যৎ দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। এমন একটি লেখ অথবা মুদ্রাও পাওয়া যায়নি, যার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের পরে সুরাষ্ট্র এবং পশ্চিম মালব নিশ্চিতভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হূণ আক্রমণ সত্ত্বেও তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য অটুট ছিল। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত যখন মারা

যান, তখন তিনি অথবা অন্য কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, অল্পকাল পরে, তাঁদেরই চোখের সামনে এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে।

৪খ.৩ গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাটদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পায়। স্কন্দগুপ্ত পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস তাই এই সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি এবং পতনের কাহিনী।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে প্রথমেই পরবর্তী সম্রাটদের সন্ন্যাস ধর্ম সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা বলা যায়। প্রথম দিকের গুপ্ত সম্রাটগণ বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম তাঁদের সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা পুরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে সন্ন্যাস ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবের ফলে তাঁদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমশ হ্রাস পায়। যুদ্ধবিমুখ সম্রাটগণ আর যাই হোক, সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতা সর্বপ্রথম প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে চোখে পড়ে। তিনি এক ধরনের মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন, যাকে অপ্রতিঘ ধরন বলা হয়। এই মুদ্রায় তিনি সন্ন্যাসী পোশাক পরিহিত। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই মুদ্রায় যে 'অপ্রতিঘ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতীয় মহাকাব্যে এবং প্রাচীন সাহিত্যে তার অর্থ 'অপরাজেয়'। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মে 'প্রতিঘ' শব্দের অর্থ ক্রোধ। সুতরাং অপ্রতিঘ শব্দের অর্থ অক্রোধ। এই মুদ্রা তাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রথম কুমারগুপ্তের বিশেষ আসক্তির পরিচয় দেয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ পণ্ডিত পরমার্থের রচনায় গুপ্ত রাজপরিবারের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বিক্রমাদিত্য (স্কন্দগুপ্ত) তাঁর রানী এবং যুবরাজ বালাদিত্যকে (নরসিংহগুপ্ত) অধ্যয়নের জন্য বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তৎকালীন গুপ্ত সম্রাটদের উপর এই বসুবন্ধুর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। পরমার্থ লিখেছেন যে, তাই সাংখ্যদর্শনের পৃষ্ঠপোষক স্কন্দগুপ্ত বৌদ্ধধর্মে আগ্রহী হয়েছিলেন।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরবর্তীকালে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিবর্তিত রাষ্ট্রকাঠামোরই অন্যতর দিক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম দিকের শাসনব্যবস্থার মধ্যে এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত কিছুসংখ্যক রাজাকে নিয়মিত করদান-এবং অন্য কয়েকটি শর্তে তাঁদের হৃত রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দিয়ে এই পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। অবশ্য সমুদ্রগুপ্তের সময় তাঁর অধীন নরপতিদের সম্পর্কে 'সামন্ত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। এই শব্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম বৈন্যগুপ্তের গুনাইগড় লেখতে (৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) দেখা যায়। মৌখারী নৃপতি অনন্তবর্মণের বারাবার গুহালেখতে তাঁর পিতাকে "সামন্ত চূড়ামণি" বলা হয়েছে। বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এ সামন্তদের দায়িত্বের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হরিষেণ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অধীন নৃপতিদের লিখিত সনদ দিয়েছিলেন। এই প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রত্যন্ত রাজ্য এবং বৈদেশিক নৃপতিদের ছাড়াও সোনাকানিক মহারাজা (৮২ গুপ্তাদের উদয়গিরি গুহালেখ) এবং মহারাজা ত্রিকমলের (৬৪ গুপ্তাব্দের গয়া লেখ) নাম পাওয়া গেছে। মধ্য ভারতের পশ্চিম অংশের তিনজন শাসক, মহারাজা স্বামীদাস,

মহারাজা ভুলুণ্ড এবং মহারাজা রুদ্রদাস যথাক্রমে ৬৭,১০৭ এবং ১১৭ গুপ্তাব্দে ভূমিদান পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে, সামন্ততন্ত্রজনিত যে দুর্বলতা, তা পরবর্তীকালের গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করেছিল।

খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যকে তার রাজনৈতিক দিক বলা হয়। সুতরাং গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুপ্তযুগের রাজারা ভূমি অথবা গ্রাম দানের সঙ্গে দণ্ডদানের এবং প্রায় সকল প্রকার রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার পরিত্যাগ করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর লেখক বুদ্ধগোষ ব্রহ্মদেয় দান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর সঙ্গে বিচার ও শাসন অধিকার যুক্ত ছিল। গুপ্তযুগে এই অধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য অনিবার্যভাবে দুর্বল হয়েছিল। এর ফলে শাসন বিষয়ে প্রায়-স্বাধীন এক ব্রাহ্মণ সামন্তশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুন্দেলখন্ডের ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক-মহারাজাদের কথা বলা যায়। এ বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত ৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে এরাণের বিষয়পতি মাতৃবিষ্ণু। তাঁর পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ হিসাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। কিন্তু মাতৃবিষ্ণু সামান্য একজন বিষয়পতি হয়েও নিজেকে 'মহারাজা' বলে অভিহিত করেছেন।

গুপ্তযুগে সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের সামরিক এবং শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন কিনা তা সঠিক বলা যায় না। তবে অসংখ্য ভূমিদান পত্র থেকে জানা যায় যে, সামরিক কর্মচারীরা নগদ বেতন পেলেও, অন্যান্য কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি পেতেন। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে অনেক সরকারি পদ বংশানুক্রমিক হয়েছিল। ভোগিক, মন্ত্রিণ, সচিব এবং অমাত্যপদ বংশানুক্রমিক হয়েছিল। হরিষেণ নিজে একজন মহাদণ্ডনায়ক ছিলেন। তাঁর পিতা ধ্রুবভূতিও তাই ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বীরসেনের পরিবার এবং প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পৃথিবীসেনের পরিবার থেকে এক পুরুষের বেশিকাল ধরে মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিকগণের জয়দত্ত, ব্রহ্মদত্ত ইত্যাদি নাম থেকে মনে হয় যে, এখানে এই পদটিও বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। এই দুইজন উপরিক সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, দামোদরপুর লেখ থেকে জানা যায় যে, প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে ছিলেন উপরিক চিরাতদত্ত, কিন্তু পরবর্তীকালে, বুধগুপ্তের সময়, এই একই ভুক্তিতে ছিলেন উপরিক-মহারাজা জয়দত্ত এবং উপরিকমহারাজা ব্রহ্মদত্ত। বলা বাহুল্য এর ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন পরিবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়েছিল, তেমনই অন্যদিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বলতর হয়েছিল। এই একই ঘটনা ঘটেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমতম প্রদেশে, সুরাষ্ট্রে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ বংশানুক্রমিক হওয়ায় সেখানে মৈত্রক রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয়ের যে চিত্র সমসাময়িক লেখ ভূমিদান পত্র দ্বারা উদ্‌ঘাটিত, সমকালীন মুদ্রায়ও তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হূণ আক্রমণ সত্ত্বেও স্কন্দগুপ্ত কিছুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তী সম্রাটগণ বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা বেশি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করতে পারেন নি। উপরন্তু, পরবর্তীকালের স্বর্ণমুদ্রায় সোনার পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পায়। তাছাড়া স্কন্দগুপ্ত বহু ও বিচিত্র রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। বুধগুপ্ত তাও করতে পারেননি। তিনি তাঁর রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলিতে বজায় রেখে অন্যত্র, যেমন গুজরাটে এবং কাথিয়াবাড়ে তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী গুপ্তযুগে রৌপ্যমুদ্রার এই দুষ্প্রাপ্যতার উপর অনেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের

মতে এই দুষ্প্রাপ্যতা তৎকালীন বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতির পরিচায়ক। সাধারণত বাণিজ্যের এই অবনতির জন্য পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলা হয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতন সত্ত্বেও ভারতের বহির্বাণিজ্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, গুপ্তযুগে রৌপ্যমুদ্রায় তুলনায় স্বর্ণমুদ্রার আধিক্য এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। অন্যদিকে রৌপ্যমুদ্রার স্বল্পতা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সঙ্কোচনের ইঙ্গিত দেয়। গুপ্তযুগের রাষ্ট্র বেসরকারি এই বসতিগুলিকে রক্ষা করত এবং পরিবর্তে মৌর্যযুগের তুলনায় কম হারে, দ্রব্যের মাধ্যমে, সেখান থেকে কর আদায় করত। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, গুপ্তযুগের এই সমৃদ্ধিই তার কাল হয়েছিল। প্রায় স্বয়ম্ভর গ্রামের অর্থ দাঁড়িয়েছিল মাথাপিছু দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস। অথচ বৃহৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের ভরণপোষণের জন্য ব্যাপক উৎপাদন, বিস্তৃত বাণিজ্য এবং পর্যাপ্ত অর্থ-রাজস্বের প্রয়োজন ছিল। পরিবর্তিত অবস্থায়, অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাসের ফলে, বাণিজ্যের পরিমাণও বিশেষ কমে গিয়েছিল। যে গিল্ডগুলি সাতবাহনদের সময় এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, গুপ্তযুগে সেগুলি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতি গ্রামে কারিগর এবং যন্ত্রশিল্পীদের রক্ষা করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্রব্যের মাধ্যমে যে কর আদায় করা হত, স্থানীয়ভাবে তাকে ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। এইভাবে যে বাণিজ্যের সাহায্যে সংগৃহীত দ্রব্যকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যেত (এবং সৈন্যদল রক্ষার জন্য যে নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি তা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এরই পরিণতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী দুর্বল হয়েছিল এবং স্থানীয় রাজা-মহারাজা, উচ্চাভিলাষী সামন্ত এবং হঠকারী রাজকর্মচারীদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি এবং পতনের সাধারণ কারণগুলি নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া এখনও পর্যন্ত প্রায় অসম্ভব। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমায় ঠিক কতজন গুপ্ত শাসক রাজত্ব করেছিলেন, তাও বলা কঠিন। এই রাজাদের সংখ্যা ছিল দশ বা তার কাছাকাছি। বিভিন্ন লেখ অথবা মুদ্রায় কিংবা সিল-এ তাঁদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই নামের অধিক কিছু পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের কৃতিত্ব অথবা ব্যর্থতা, এমনকি পারর্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

মনে হয় স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের বৎসরগুলিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্গতির সময় পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সময় এসেছিল হূণরা। এই হূণদের আদি বাসস্থান ছিল চীনের কাছাকাছি। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে, তারা দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি শাখা ভল্গানদীর দিকে এবং অন্যটি ইক্ষাকু (অ'াস) নদীর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই দ্বিতীয় শাখাটি, পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে, ইক্ষবাকু উপত্যকায় বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এখান থেকে তারা পারস্য এবং ভারত আক্রমণ করে। পারস্য সম্রাট ফিরোজ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি, কিন্তু গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত পেরেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের পরর্তীকালে, হূণদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা, সুঙইয়ুন এবং কোসমাসের বিবরণ থেকে জানা যায়। সুঙইয়ুন ৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের রাষ্ট্রদূত হয়ে গান্ধারে হূণরাজার কাছে এসেছিলেন। কোসমাস, একজন আলেকজান্দ্রিয় গ্রীক, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বিবরণ লিখেছিলেন। জৈন গ্রন্থ *কুবলয়মালা* (৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এ বিষয়ে আংশিক সাহায্য করে।

'স্কন্দগুপ্তের পরবর্তীকলে ভারতে হূণ আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তোরমান। তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে হূণ শক্তিকে সংহত করেন। শতদ্রু থেকে যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁর ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রাগুলি এই আভাস দেয়। পরে তিনি পাঞ্জাব থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। মনে হয় এই আক্রমণে তিনি গুপ্ত বংশজাত কোন কোন ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য তা সম্ভব হয়েছিল। *কুবলয়মালা*-য় গুপ্ত বংশজাত হরিগুপ্তকে তোরমানের 'গুরু' বলা হয়েছে। পাঞ্চালের অন্তর্গত রামনগরে আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দের হরিগুপ্ত নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্ভবত এঁরা দুজন অভিন্ন ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, হরিগুপ্ত শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তোরমানের দু'টি সিল কৌশাম্বীতে পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় যে তিনি অন্তর্বেদী, অন্তত কৌশাম্বী পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি যে মালব জয় করেছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর 'রাজাধিরাজ' এবং 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা থেকে মনে হয় যে, তিনি উত্তর ভারতে গুপ্ত সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ জয় করেছিলেন। তাঁর বিক্ষিপ্ত মুদ্রা থেকে মনে হয় যে, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অনেকাংশ তিনি জয় করেছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে মনে করেন যে ৪৯৯-৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি গুপ্তদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কলহের পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিজিত অঞ্চলে শাসনব্যবস্থায় তিনি অকারণ হস্তক্ষেপ করেন নি। ধন্যবিষ্ণুর প্রতি তাঁর আচরণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় তিনি সূর্য প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ধন্যবিষ্ণু এরাণে নারায়ণ মন্দির স্থাপন করতে পেরেছিলেন। পাঞ্জাবে প্রাপ্ত কুরা লেখতে "রাজাধিরাজ মহারাজ-তোরমান-শাহি-জৌবল"-এর উল্লেখ আছে। এই লেখটি প্রকৃতপক্ষে তোরমানের কিনা, এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সে যাই হোক, এতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের কথা আছে। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। *কুবলয়মালা*-এ জৈন ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জেলিতে প্রাপ্ত তোরমানের একটি তাম্র পট্টে একটি মন্দিরের হিতার্থে তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে হয় যে তোরমান ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর রাজ্যজয়কে স্থায়ী করতে পারেননি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কোসমাসের বিবরণে বলা হয়েছে যে সিন্ধুনদ হূণ অধিকৃত অঞ্চল এবং অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল। এ থেকে মনে হয় যে, তোরমান এরাণ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন হতে পারে যে, ভানুগুপ্তই তাঁকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, কেননা এরাণ লেখ এ বিষয়ে নীরব। তোরমানের এই ব্যর্থতার জন্য তাঁর পুত্র মিহিরকুলকে পুনরায় যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। গোয়ালিয়রে মিহিরকুলের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে (আনুমানিক ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং ঐ সময়, এই অঞ্চল যে তাঁর অধিকারে ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে মিহিরকুল সমগ্র ভারত জয় করেছিলেন। কোসমাসও তাঁকে সমগ্র ভারতের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দুজন ভারতীয় নৃপতি, মালবের রাজা যশোধর্মন এবং নরসিংহগুপ্তের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

হূণ এবং বকাটকদের যুগপৎ আক্রমণের ফলে মালব তখন বিপর্যস্ত। এর ফলে এই অঞ্চলের উপর গুপ্তদের

অধিকারও অনেকাংশে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় নরপতি যশোধর্মন। তিনি মালবে নিজের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি এত বেশি শক্তি অর্জন করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে মিহিরকুলকে পরাজিত করা, এমনকি গুপ্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বকেও অস্বীকার করা সম্ভব হয়েছিল।

মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যশোধর্মনের সাফল্যের কথা ৫৮৯ মালবাব্দের, অর্থাৎ ৫৩১ খ্রিস্টাব্দের, মান্দাসোর লেখ থেকে জানা যায়। এই লেখ একটি প্রশস্তি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এতে কিছুটা অত্যুক্তি আছে। তবুও এর মোটামুটি বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। এতে বলা হয়েছে যে, উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত (গঞ্জাম জেলা) পর্যন্ত এবং পূর্বে লৌহিত্য নদ (ব্রহ্মপুত্র) থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর বাহুবলের দ্বারা হিমালয়ের দুর্গমতার দর্প চূর্ণ করেছিলেন। এমনকি পরাক্রান্ত রাজা মিহিরকুলও তাঁর কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন।

মান্দাসোর লেখতে মিহিরকুল এবং হূণ দুইয়েরই উল্লেখ আছে, কিন্তু এমনভাবে আছে যে, তা থেকে মিহিরকুল যে হূণ ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। তোরমান এবং মিহিরকুলের মুদ্রা সম্পর্কেও সে একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় প্রায় সব ঐতিহাসিকই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে হূণদের বৃহৎ ভূমিকার উল্লেখ করায় ডঃ মজুমদার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই বিশ্বাস তোরমান এবং মিহিরকুল হূণ নৃপতি ছিলেন, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হয়তো তাঁরা হূণই ছিলেন, কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তোরমান একজন কুষাণ নরপতি ছিলেন এবং অনেকটা হূণদের মতো হওয়াতে ভারতে তাঁকে হূণ বলে ভুল করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কুরা লেখতে তোরমানকে শাহিজেবৈল বলা হয়েছে। এবং সম্ভবত জেবৈল ছিল হূণদের একটি উপাধি। সে যাই হোক, যশোধর্মন মিহিরকুলকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারেন নি। অনতিকাল পরে যশোধর্মনের পতন ঘটলে, মিহিরকুল পুনরায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

যশোধর্মনের পর মিহিরকুলকে হয়তো নরসিংহগুপ্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিহিরকুল এবং নরসিংহগুপ্তের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য আমাদের প্রধানত হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। হিউয়েন সাঙ ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সাকলে (শিয়ালকোট) গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর সাকল দর্শনের "কয়েক শতাব্দী" পূর্বে বালাদিত্যের দ্বারা মিহিরকুল পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা, প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দী পূর্বে নয় প্রায় একশো বৎসর আগে ঘটেছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে সন তারিখের এই অসঙ্গতি, মিহিরকুল সম্পর্কিত তাঁর বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে হিউয়েন সাঙের চেয়ে যোগ্যতার উপাদান আমাদের হাতে নেই।

নরসিংহগুপ্ত যশোধর্মনের আক্রমণের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ায় মিহিরকুল সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, নরসিংহগুপ্ত মিহিরকুলকে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। তার পরে নরসিংহগুপ্ত কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করে মিহিরকুলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন, হিউয়েন সাঙ তার বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কাহিনী সর্বদা যথাযথ নয়, তবুও তাঁর মূল বক্তব্য সত্য বলে মেনে নিতে হয়তো কোন বাধা নেই। একথা মেনে নেওয়া যায় যে, বালাদিত্য মিহিরকুলকে

পরাজিত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন। মিহিরকুলের এই পরাজয়ের ফলে ভারতে হূণদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়েছিল। এর পরে আর কোনোদিন হূণরা ভারত ইতিহাসের বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি।

উপরের এই বিবরণ থেকে মনে হয় যে, মিহিরকুল দুইবার, একবার যশোধর্মনের কাছে এবং আর একবার নরসিংহগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। অনেকে এ বিষয়ে একটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন যে, এমনও হতে পারে যে, যশোধর্মন স্বাধীনতা ঘোষণা করে নরসিংহগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি হয়তো তাঁর পরবর্তী সমৃদ্ধির দিনগুলিতে মিহিরকুলের বিরুদ্ধে তাঁদের মিলিত জয়লাভকে তাঁর একক জয়লাভ বলে ভেবেছিলেন। মান্দাসোর লেখতে হয়তো এই জয়লাভের কথাই বলা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, মিহিরকুল এবং নরসিংহগুপ্তের বিরোধের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ছিল না। ধর্মীয় প্রশ্ন এই বিরোধের বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নরসিংহগুপ্ত নিজে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে মিহিরকুল ছিলেন প্রচণ্ডভাবে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম তাই এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

তোরমান এবং মিহিরকুলের আক্রমণের সময় এবং অনেকাংশে তাঁদের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভাঙনের চিহ্নগুলি আরও প্রকট হয়েছিল। প্রথমত, সামন্ত নরপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এই সময় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের আর্থিক সম্পদও ক্রমশ কমে এসেছিল। একই ধরনের (রাজার তীরন্দাজ মূর্তি-সম্ভবলিত) অল্পসংখ্যক তৎকালীন হীনমানের মুদ্রায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, মৌখরি এবং পরবর্তী গুপ্ত নরপতিদের বিভিন্ন লেখতে চারদিকে যুদ্ধবিগ্রহের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে অস্থির উত্তেজনায় মুহূর্তগুলির কথা মনে আনে।

বকাটকগণের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, বকাটক বংশের বৎসগুল্ম শাসক হরিষেণ এই সময় মালব, গুজরাট এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপর তাঁর রাজনৈতিক অধিকার বিস্তৃত করেন। হরিষেণের উত্থান খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, গুপ্তগণ যখন হূণদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন হরিষেণ এই অঞ্চলগুলি আক্রমণ করেছিলেন, যদিও তাঁর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

হরিষেণের পর এসেছিলেন যশোধর্মন। তিনি মালবে নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আনুমানিক ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করে তিনি আবার ধূমকেতুর মতোই মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। মান্দাসোর লেখতে তাঁর রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবুও বলা যায় যে, হূণ এবং গুপ্তদের পরাজিত করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ভানুগুপ্ত যা পারেন নি, তিনি তাই পেরেছিলেন। গুপ্ত সম্রাট নরসিংহগুপ্ত তাঁকে প্রতিহত করতে পারেননি। কিন্তু তিনিও কোন স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের উত্তরবঙ্গের একটি ভূমিদানপত্রে দেখা যায় যে, সেখানে গুপ্ত সম্রাটের নামোল্লেখ করা হয়েছে, যশোধর্মনের করা হয়নি।

অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে, যশোধর্মন বিদ্রোহের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ক্ষয়িষ্ণু গুপ্তসাম্রাজ্যের

পক্ষে তা মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মৌখরিগণ এবং পরবর্তী গুপ্তগণ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাই ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ যত আলগাভাবেই হোক না কেন, যে ঐক্যসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল, হূণদের নির্মম তরবারি তা ছিন্ন করেনি, যশোধর্মনের উচ্চাশা, করেছিল। সুতরাং তাঁর মতে, হূণদের তুলনায় যশোধর্মন সাম্রাজ্যের বেশি ক্ষতি করেছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে পরবর্তী গুপ্তদের কী সম্পর্ক ছিল তা সঠিক বলা যায় না। নাম, সময় এবং উভয়ের অধিকৃত অঞ্চল দেখে মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পরবর্তী গুপ্তদের কোন লেখতে এই রক্তের সম্পর্কের উল্লেখ নেই। পরবর্তী গুপ্তদের প্রথম রাজা কৃষ্ণগুপ্তের আফসদ (গয়ার নিকটবর্তী) লেখতে তাঁদের 'সৎবংশজ' বলা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই পরবর্তী গুপ্তগণ মালব এবং মগধ শাসন করতেন।

মৌখরিগণের মতো পরবর্তী গুপ্তগণও প্রথমদিকে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। এই বংশের চতুর্থ প্রতিনিধি কুমারগুপ্ত মৌখরি বংশের চতুর্থ ব্যক্তি রাজা ইশানবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে, একই সময়ে এই দুটি বংশের উত্থান ঘটেছিল। কুমারগুপ্তের প্রথম তিনজন পূর্বসূরী, কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত এবং জীবিতগুপ্ত সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এই পরিবারের খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকের আফসদ লেখতে জীবিতগুপ্তের যুদ্ধাভিযানের কথা আছে। তবে তিনি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামন্ত নৃপতি হিসাবে, না স্বাধীন রাজা হিসাবে এই যুদ্ধ করেছিলেন, তার কোন উল্লেখ সেখানে নেই। কুমারগুপ্তও কি হিসাবে ইশানবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন, তাও অনিশ্চিত। তবে তিনি সামন্ত নৃপতিরূপেই যদি জয়লাভ করে থাকেন, তাহলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই জয়লাভের ফলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উত্থানের পথ সুগম হয়েছিল। অন্তত কৃষ্ণগুপ্তের সময় থেকে পরবর্তী গুপ্তগণ স্বাধীন হয়েছিলেন। যুদ্ধে কুমারগুপ্ত যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন, তার প্রমাণ এই যে, আফসদ লেখতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র দামোদরগুপ্ত পুনরায় মৌখরিদের পরাজিত করেছিলেন।

শুধু মৌখরিগণ এবং পরবর্তী গুপ্তগণ নয়, 'বঙ্গ' অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গাদেশও (সমতট) এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিল। গুণাইগড় লেখতে বৈন্যগুপ্তকে 'মহারাজা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন কিনা, এই লেখতে তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা তাঁর স্বাধীনতার পরিচায়ক। তা যদি হয়, তাহলে তাঁর সময় থেকেই বঙ্গে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর তা যদি না হয়, তাহলেও অল্পকাল পরে 'মহারাজাধিরাজ' আখ্যাযুক্ত স্থানীয় রাজাদের অধীনে বঙ্গা গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই রাজাদের মধ্যে একজন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। যদি বা আগে না হয়, অন্তত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বঙ্গা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বঙ্গের এই স্বাধীন নৃপতিগণ তাঁদের রাজত্বকালের উল্লেখ করে ভূমিদানপত্র প্রচার করেছিলেন।

নরসিংহগুপ্ত যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন অভ্যন্তরীণ কলহ এবং হরিষেণ ও তোরমানের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যের যে অবস্থা হয়েছিল, তৎকালীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল অনেকটা সেইরকম। অল্পকাল পরে যশোধর্মন

অস্ত্রধারণ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, মান্দাসোর লেখতে যশোধর্মনের যে কৃতিত্বের কথা আছে, তার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। ছিল নেহাতই প্রথাগত দিগ্বিজয়-বর্ণনা। এই বর্ণনার আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করলেও, বোধহয় বলা চলে যে তাঁর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বলভীর মৈত্রক বংশের রাজা প্রথম ধ্রুবসেন (৫২৫-৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর ১৪টি দানপত্র পাওয়া গেছে। সর্বত্র তিনি 'পরমভট্টারক পদানধ্যাতা' শব্দগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে গুপ্ত সম্রাটের প্রতি তাঁর নামমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম ধ্রুবসেনের অল্পকাল পরে বলভীর নথিপত্রে আর এই শব্দগুলি পাওয়া যায় না। ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের দামোদরপুর লেখও এই অঞ্চলে একই স্থিতাবস্থার পরিচয় দেয়। এর থেকে মনে হয় যে, গৌড়ের উপর তখন গুপ্তদের অধিকার বলবৎ ছিল। যশোধর্মন যদি সত্যিই লোহিত্য নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে অবশ্যই গৌড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। অথচ বুধগুপ্তের সময়ের দামোদরপুর লেখর সঙ্গে ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের লেখর তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভুক্তিশাসনে ইতিমধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। জমির হস্তান্তর বিষয়ে একই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ঋভুপাল নামক একজন নগরশ্রেষ্ঠিন এই অর্ধ শতাব্দীরও বেশিকাল ধরে সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তখনও পূর্বাঞ্চলে গুপ্তশাসনের ঐতিহ্যে কোন ছেদ পড়েছিল বলে মনে হয় না।

বিহার থেকে গুপ্তদের উচ্ছেদ সাধনে মৌখরীগণ বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একের পর এক, তাঁদের বিভিন্ন লেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরহা লেখতে (৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) ইশানবর্মণের গৌড় অভিমুখে অভিযানের কথা আছে কিন্তু গুপ্তদের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা নেই। দেওবারানর্ক লেখ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে ইশানবর্মণের পুত্র এবং পৌত্র সর্ববর্মণ এবং অবন্তীবর্মণ, বিহারের শাহাবাদ জেলা অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ কোশলের শিবগুপ্তের সিরপুর লক্ষণমন্দির লেখতে বলা হয়েছে যে, মগধ সূর্যবর্মণের অধিকারে ছিল। এই সূর্যবর্মণ মৌখরি ইশানবর্মণের পুত্র ছিলেন। অবশ্য তিনি রাজা হয়েছিলেন কিনা, তা অনিশ্চিত। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, মৌখরিগণই গুপ্তদের বিহার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু বিহারের পতন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সমার্থক এবং সমকালীন ছিল বলে অনেকে মানেন না। তাঁরা মনে করেন যে, ৫৫১ খ্রিস্টাব্দের পরে অন্তত ১৯ বৎসর বঙ্গাদেশে এবং ওড়িশা গুপ্তদের অধিকারে ছিল। ওড়িশার খল্লিকোটের অন্তর্গত সুমণ্ডল গ্রামে প্রাপ্ত একটি লেখতে ২৫০ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ ৫৬৯-৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, কলিঙ্গের উপর গুপ্তদের আধিপত্যের কথা আছে। তাঁরা মনে করেন যে, বিহার হারানোর পরে বঙ্গাদেশকে ভিত্তি করে, গুপ্তগণ ওড়িশার উপর তাঁদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু শুধু সুমণ্ডল লেখর উপর নির্ভর করে বঙ্গাদেশ সম্পর্কে একথা বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

জিনসেন-রচিত জৈনগ্রন্থ হরিষেণ *পুরাণ*-এ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে দু'টি ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি ঐতিহ্য অনুসারে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৩১ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৫৫০-৫৫১ খ্রিস্টাব্দে, এই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। দ্বিতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এই পতন ঘটেছিল ২৫৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৫৭৩-৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে মনে করেন যে, গুপ্তগণ বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হারিয়েছিলেন ৫৫০-৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এবং বঙ্গাদেশ ও ওড়িশা হারিয়েছিলেন ৫৭৩-৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু অন্য উপাদানের অভাবে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে দুইটি ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, এই মাত্র বলা যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, হূণ আক্রমণকে এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ বলা যায় না। হূণ আক্রমণ এই পতনকে সাহায্য করেছিল মাত্র। তাঁর মতে গুপ্তসম্রাট-পরিবারের অভ্যন্তরীণ কলহ, যশোধর্মনের উচ্চাভিলাষ, সামন্ত নৃপতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা, এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রকৃত কারণ। হূণ আক্রমণ বিপদের সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে হূণ কখনও বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারেনি।

ডঃ রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যে কারণগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সঙ্গে ডঃ মজুমদারের মতের মূলত কোন বিরোধ নেই। তিনি বলেছেন যে একদা সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের প্রতিভা দ্বারা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে দ্রুত তা পতনের পথে অগ্রসর হয়। গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে স্কন্দগুপ্তই (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসক যিনি পশ্চিম অঞ্চল নিজ অধিকারে রেখেছিলেন। তাঁর পরে গুপ্তদের সুরাষ্ট্র অথবা পশ্চিম মালবের বৃহৎ অংশের উপর আর কোন অধিকার ছিল না। বুধগুপ্তই (৪৬৭-৭৭ খ্রিস্টাব্দ—৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) বোধহয় শেষ সম্রাট যাঁর আদেশ যুগপৎ নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং নর্মদাতীরে মান্য করা হত। তাঁর পরে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা কোনক্রমে পূর্ব মালব এবং উত্তরবঙ্গের উপর কিছুদিনের জন্য তাদের অধিকার বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু সবদিক থেকে তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এইভাবে জিনসেন-বর্ণিত অন্যতম ঐতিহ্য অনুসারে ৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আর্যাবর্তে রাজনৈতিক অধিকার মৌখরি এবং পুষ্যভূতি বংশের হাতে চলে গিয়েছিল। ভারত-ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু মগধ থেকে কনৌজ স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে নতুন কোন কারণ ছিল না। এই কারণগুলি হল, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সৃষ্টি এবং গুপ্তরাজপরিবারের কলহ।

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রের আক্রমণে এই সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের অল্পকাল পরে মধ্য এশিয়ার হূণগণ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পাঞ্জাব ও পূর্ব মালব অধিকার করেছিল। ভির্তারি কুরা, গোয়ালিয়র এবং এরাণে প্রাপ্ত বিভিন্ন লেখতে তার নির্ভুল সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই হূণ আক্রমণ প্রসঙ্গে তোরমান এবং মিহিরকুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হূণ আক্রমণের পরে সেনাপতি এবং সামন্ত নৃপতিদের উচ্চাশার কথা বলা যায়। স্কন্দগুপ্তের সময় পর্ণদত্ত নামক একজন গোপ্তৃ সুরাষ্ট্র শাসন করতেন। অল্পকাল পরে মৈত্রক বংশের ভতার্ক, সেনাপতিরূপে নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরী প্রথম ধারসেন 'সেনাপতি' অভিধায় সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসক দ্রোনসিংহকে রাজকীয় মর্যাদা দিতে হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বংশেরই একটি শাখা মালবের পশ্চিমতম অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে সহ্যাদ্রি এবং বিন্ধ্য পর্বতের দিকে বিস্তৃত অংশ জয় করেছিলেন।

মৈত্রকগণ ব্যতীত মান্দাসোরের শাসকগণও একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। মধ্যদেশের মৌখরিগণ,

বর্ধমানভুক্তি এবং কর্ণসুবর্ণের শাসকগণ মান্দাসোরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মান্দাসোরের (মালবের) শাসক যশোধর্মন কী কাণ্ড করেছিলেন, সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর গুপ্তগণ পূর্ব মালব পুনরধিকার করলেও, অন্তত পশ্চিম মালব করতে পারেননি। এর একাংশ মৈত্রকদের অধিকারে ছিল। অপর অংশ, উজ্জয়িনীর উপর পরবর্তী শতাব্দীতে কলচুরি বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরিগণও প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের লেখ থেকে বারাবনকী, জৌনপুর এবং গয়া জেলার উপর তাঁদের অধিকারের কথা জানা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের এইসব অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে মৌখরিগণ গুপ্তদের অধীনে সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। অল্পকাল পরে ইশানবর্মণ মৌখরি গুপ্তদের সঙ্গে এবং হয়তো হূণদের সঙ্গেও শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহারাজাধিরাজ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

মৌখরীগণের মতো বঙ্গদেশের শাসকগণও খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিলেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ অবশ্যই গুপ্তদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে সমতটকে প্রত্যন্ত রাষ্ট্ররূপে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ তখন গুপ্তদের অধিকারে ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে প্রায় এক শতাব্দী উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দামোদরপুরে প্রাপ্ত পাঁচটি লেখতে তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইশানবর্মণের হরহা লেখ থেকে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি, গৌড়গণের উত্থান ঘটেছিল। হরহা লেখতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গৌড়গণ সমুদ্রতীরে বাস করতেন। সুতরাং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গের উপকূলবর্তী স্থলভাগ নিশ্চিতভাবে তাঁদের বাসভূমি ছিল। পূর্বে বর্ণিত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদের সম্পর্কে 'গৌড়' শব্দটি ব্যবহৃত না হলেও, তাঁদের ব্যবহৃত 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, তাঁরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছিলেন।

গুপ্তসম্রাট-পরিবারের অভ্যন্তীরণ বিরোধ এই সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য বিরোধের কাহিনী সত্য অথবা মিথ্যা যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বংশধরেরা যে সর্বদা তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেননি, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তাঁরা প্রায়ই পরবর্তীকালের বিরোধে-সংঘর্ষে বিপরীতপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালের গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞাতিভাই বকাটকগণের সম্পর্ক ভাল ছিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র (কন্যা প্রভাবতীর মাধ্যমে) নরেন্দ্রসেন বকাটকের সঙ্গে মালবের অধিপতির শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। তাঁর পৌত্র হরিষেণ অবন্তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের দাবি করেছিলেন। মালবের অংশবিশেষের সঙ্গে গুপ্তগণ সর্বদা জড়িত ছিলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে বকাটকদের জয়লাভ অবশ্যই তাঁদের জ্ঞাতিভাই গুপ্তদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছিল।

প্রথম দিকের গুপ্তসম্রাটগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের গুপ্ত সম্রাটদের, বিশেষত বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত এবং বালাদিত্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল. ইতিপূর্বে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্য রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে বালাদিত্য কীভাবে তাঁর মায়ের অনুরোধে বন্দী মিহিরকুলের মুক্তি দিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ কাহিনী কতদূর সত্য, তা বলা

যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, হিউয়েন সাঙ যাঁদের কাছ থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সপ্তম শতাব্দীর সেই ভারতীয়দের দৃষ্টিতে পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণ দয়া ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, শৌর্য-বীর্যের জন্য ছিলেন না। সে যাই হোক, বালাদিত্যের এই ভ্রান্ত উদারতার ফলে মিহিরকুল তাঁর অত্যাচারী শাসন চালিয়েছিলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা, এর ফলে যশোধর্মন এবং পরে ইশানবর্মন এবং প্রভাকরবর্ধনের সামনে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেননি এবং যুগপৎ হূণদের, এবং উত্তর ভারতে গুপ্তশাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

৪খ.৪ গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার জন্য প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। গুপ্তযুগের কিছুসংখ্যক লেখ প্রথম সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন ফ্লিট এবং পরবর্তীকালে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। এ যুগের বিভিন্ন মুদ্রা এবং সিল সংকলন ও প্রকাশ করেন এ্যালান। স্মৃতিশাস্ত্র, বিশেষত *মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি* ইত্যাদিও আমাদের সাহায্য করে। তবে স্মৃতিশাস্ত্র তত্ত্বের দিক প্রাধান্য পেয়েছে, বাস্তব দিক পায়নি। ফা-হিয়েনের রচনার মূল্য তুলনায় বেশি। তাঁকে স্মৃতিশাস্ত্রের পরিপূরক বলা যায়।

মৌর্যযুগের তুলনায় গুপ্তযুগের রাজনৈতিক আলোচনায় এবং অবনতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। *অর্থশাস্ত্র*-র মতো কোন গ্রন্থ এ যুগের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। মনু এবং *মহাভারত*-এর রাজ-ধর্মসংক্রান্ত অংশে রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে জোরালো আলোচনা আছে। কিন্তু এ যুগের নীতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই আলোচনা অন্যমনস্ক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা গতানুগতিক। কামন্দকের *নীতিসার অর্থশাস্ত্র*-র একটি সঙ্কলন মাত্র। এতে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাব। এই গ্রন্থের নীতিবোধ-সম্পর্কিত মনোভাবের পিছনে মহাভারত-এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজার রাষ্ট্রপরিচালনা-সম্পর্কিত নির্দেশসমূহে কৌটিল্যের নির্মম মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে দুষ্ট প্রজাদের প্রকাশ্যে অথবা গোপনে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাজা যেখানে শক্তিশালী এবং যুদ্ধের স্থান-কাল যখন তাঁর অনুকূলে, সেখানে তিনি খোলাখুলি যুদ্ধ করবেন, আর প্রতিকূল অবস্থায় তিনি অশ্বত্থামার মতো বিশ্বাসঘাতকার আশ্রয় নেবেন। *কাত্যায়নস্মৃতি* এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রেও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। মনুতে অবশ্য যুদ্ধকে শেষ উপায় বলা হয়েছে। শত্রুদমনের জন্য সেখানে অন্য উপায়ের, যেমন আলোচনার, দানের এবং ভেদনীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। বিজিত রাজ্যগুলিতে ধর্ম, প্রচলিত বিধান এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর অকারণ হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করা হয়নি। এ যুগের সব স্মৃতিগ্রন্থেই রাজার অতিমানবিক সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। *দেবলস্মৃতি*-তে বলা হয়েছে যে, রাজা মনুষ্যবেশে দেবতা সুতরাং তাঁর কোন ক্ষতি করা উচিত নয়।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় প্রকার শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এই প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন মদ্রকগণ, যৌধেয়গণ, অর্জুনায়নগণ, মালবগণ, প্রার্জুনগণ, কাকগণ, সোনাকানিকগণ, আভিরগণ ইত্যাদি, বেশিরভাগই ছিল উত্তর ভারতে। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে এই গণরাজ্যগুলির সঙ্গে কোন রাজার নাম যুক্ত করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, মালবগণ, যৌধেয়গণ প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই গণরাজ্যগুলিতে সমগ্র জনসমষ্টি সার্বভৌম অধিকার ভোগ করত না। এগুলিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রায়ই ভূম্যধিকারী

ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হত। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহকের পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অনেক সময় এই পদের সঙ্গে রাজকীয় অভিধা যুক্ত করা হত সোনাকানিগণের যিনি প্রাধান, তিনি এই অভিধা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পদটিও বংশানুক্রমিক হয়েছিল। যৌধেয়গণের যিনি প্রধান, তাঁকে মহারাজা বলা হত।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই গণরাজ্যগুলির কথা আর শোনা যায়নি।

মৌর্যযুগের মতো গুপ্তযুগেও শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল, তবে মৌর্যদের মতো গুপ্তরাজারাও অনেক সময় তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। মৌর্যযুগের রাজাদের মতো গুপ্তযুগের রাজারা সাধারণ 'রাজন' অভিধায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। সমসাময়িক লেখতে রাজাকে 'অচিন্ত্যপুরুষ', 'লোকধামদেব', 'পরম দৈবত' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে সব গুপ্ত সম্রাটই শক-কুষাণদের অনুকরণে 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন অভিধায় তাঁদের দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে, ধনদ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ এবং অন্তকের (যমের) সমকক্ষ বলা হয়েছে। তাঁকে কৃতান্তের যুদ্ধ-কুঠাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই আড়ম্বরপূর্ণ অভিধাগুলি গুপ্ত সম্রাটের মর্যাদাবৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে, প্রকৃত ক্ষমতাবৃদ্ধি করে না। এই অভিধাগুলির মাধ্যমে গুপ্তযুগে, মৌর্যযুগের পরে, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে, রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্র বলতে মৌর্যযুগে যা বোঝাত, গুপ্তযুগে তা আর বোঝাত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, রাজতন্ত্রের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে ভারতে নতুন রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজতন্ত্র মৌর্যযুগের তুলনায় দুর্বলতর ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিবর্তিত রাজতন্ত্রের স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। রাজা দেবতার সৃষ্টি, এই বিশ্বাস তখন অনেকাংশে শিথিল হয়েছিল। শুধু কর্মের ক্ষেত্রে রাজা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সাদৃশ্য স্বীকার করা হত। ঈশ্বরের মত রাজাও অভ্রান্ত, একথা মানা হত না। ঈশ্বরের মতো রাজাকেও সম্মান করা উচিত, শুধু এইমাত্র মনে করা হত। *নারদস্মৃতি*-তে বলা হয়েছে যে, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতো। জনকল্যাণের জন্য রাজাকে কঠোর ও দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাপন করতে হত। যুবরাজের জন্য নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রাজা কর্তব্যভ্রষ্ট হলে, জনগণ মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারত। স্মৃতিশাস্ত্রে এই বিদ্রোহের অনুমোদন ছিল।

রাজা শুধু শাসনব্যবস্থায় শীর্ষে ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে। সামরিক, রাজনৈতিক, শাসনবিষয়ক এবং বিচারসংক্রান্ত সব অধিকারের কেন্দ্রে ছিলেন রাজা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্রীরা থাকতেন, কিন্তু সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান বিচারক। প্রদেশপাল এবং অন্যান্য বেসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, রাজা নিযুক্ত করতেন এবং তাঁরা একমাত্র তাঁর কাছেই দায়ী থাকতেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয় তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হত। সুতরাং আপতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতেন। রাজা সাধারণত মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। দ্বিতীয়ত, রাজা আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না। তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের বিধান মেনে

চলতে হত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন না। তৃতীয়ত, শাসন-সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নিগম সভাগুলি ভোগ করত। প্রকৃতপক্ষে, সেনাবাহিনী এবং বৈদেশিক নীতি ভিন্ন অন্যান্য সব বিষয়ই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হত। সর্বোপরি রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল।

রাজার পরেই স্থান ছিল যুবরাজের। বৈদিকযুগের মতো, গুপ্তযুগে রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল, অবশ্য রাজা তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারতেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

রাজা বিভিন্ন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে কেন্দ্রে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এইভাবে যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তা বহুলাংশে গতানুগতিক ছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ উল্লিখিত মন্ত্রী এ যুগের বেসামরিক শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন। অন্য উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী সন্ধিবিগ্রহিক (শান্তি ও বুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত) এবং অক্ষপটলাধিকৃত (সরকারি নথিপত্রে ভারপ্রাপ্ত) প্রধান ছিলেন। সন্ধিবিগ্রহিক পদটি গুপ্তযুগেই প্রথম সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের মন্ত্রীর মতো, ইনিও যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সঙ্গী হতেন।

রাজপদের মতো, মন্ত্রীপদও গুপ্তযুগে বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। বীরসেনের উদয়গিরি লেখতে "আম্বয়প্রাপ্ত সচিব্য", এই কথাগুলি আছে। এ থেকে মন্ত্রীপদের বংশানুক্রমিকতা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়াআ যায়। শুধু মন্ত্রীপদই নয়, অন্য অনেক উচ্চপদও তখন বংশানুক্রমিক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাদণ্ডনায়ক হরিষেণ, মহাদণ্ডনায়ক ধ্রুবভূতির পুত্র ছিলেন। মন্ত্রী পৃথিবীসেন, মন্ত্রী শিখরস্বামিনের পুত্র ছিলেন। মান্দাসোর, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের গোপ্তৃ পদও ছিল বংশানুক্রমিক।

গুপ্তযুগে কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পদগুলির মধ্যে কয়েকটির পূর্ব ঐতিহ্য ছিল। মহাদণ্ডনায়ক হয়তো সেনাপতি, কিংবা পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। এই পদটির সূচনা হয়েছিল কুষাণদের সময়। তিনি অন্য দণ্ডনায়কদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। মহাবলাধিকৃত ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সাতবাহন রাজাদের মহাসেনাপতির সঙ্গে এই পদটির বিশেষ মিল ছিল । মহাবলাধিকৃত তাঁর অধীন মহাশ্বপতি (অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান), ভাটাশ্বপতি (নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান), মহীপীলুপতি (হস্তিবাহিনীর প্রধান), সেনাপতি এবং বলাধিকৃতকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মহাপ্রতিহার ছিলেন হয়তো দ্বাররক্ষী, বা প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান। তিনি অন্য প্রতিহারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।

গুপ্তযুগে সামরিক-অসামরিক পদগুলির মধ্যে কোন স্থির ও স্থায়ী ভেদরেখা ছিল না। একই ব্যক্তি সন্ধিবিগ্রহিক, কুমারামাত্য এবং মহাদণ্ডনায়ক নিযুক্ত হতে পারতেন।

গুপ্তযুগে কুমারামাত্য এবং আয়ুক্তগণ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ সাধারণভাবে রাজকর্মচারীদের অমাত্য বলা হয়েছে। গুপ্তযুগের আয়ুক্তগণের অশোকের যূত এবং *অর্থশাস্ত্র*-র যুক্তগণের পূর্ব ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গুপ্তগণ অমাত্যদের মধ্যে থেকে কুমারামাত্য নামক এক নতুন শ্রেণীর কর্মচারীর সৃষ্টি করেন। 'কুমারামাত্য' বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হত, সে সম্পর্কে নানাজন নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারও মতে তিনি ছিলেন কুমারের অর্থাৎ যুবরাজের মন্ত্রী। দুই শ্রেণীর কুমারামাত্য ছিলেন। একশ্রেণীর কুমারামাত্যগণ রাজার কাজে নিযুক্ত থাকতেন (পরমভট্টারকপাদীয়), আর এক শ্রেণী যুবরাজের

কাজে (যুবরাজপদীয়)। তাঁরা সম্ভবত যুবরাজের ভারপ্রাপ্ত, অথবা তাঁদের উপদেষ্টা ছিলেন। গুপ্তযুগে কুমারামাত্যগণ কখনও জেলা (বিষয়) শাসনে কখনও বা প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিযুক্ত হতেন। অনেকে এঁদের ইংরেজ আমলে ভারতীয় সিভিল সারভিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ যুগে আয়ুক্তগণের হাতে মাঝে মাঝে বিজিত রাজার সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দায়িত্ব দেওয়া হত। তাঁরা জেলা এবং রাজধানী তত্ত্বাবধানের ভারও পেতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে দেশ এবং ভুক্তি, কখনও বা রাষ্ট্র বলা হত। এগুলি আবার বিভিন্ন জেলায়, অর্থাৎ প্রদেশে অথবা বিষয়ে বিভক্ত হত। বিভিন্ন লেখতে দেশ হিসাবে সুকুলি দেশ, সুরাষ্ট্র, দাভালার (জব্বলপুর এলাকা) উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিন্দী (যমুনা) এবং নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল, পূর্বমালবসহ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি সবই ছিল গঙ্গা উপত্যকায়। এদের মধ্যে পুণ্ড্রর্ধনভুক্তি (উত্তরবঙ্গ), তীরভুক্তি (উত্তর বিহার), নগরভুক্তি (দক্ষিণ বিহার), শ্রাবন্তীভুক্তি (অযোধ্যা) এবং অহিচ্ছত্রভুক্তি (রোহিলখণ্ড) উল্লেখযোগ্য। প্রদেশ অথবা বিষয়গুলির মধ্যে গুজরাটে লাট বিষয়, জব্বলপুরে ত্রিপুরি বিষয়, পূর্বমালবে ঐরিকিন, গাঙ্গেয় দোয়াবে অন্তর্বেদী এবং দিনাজপুরে কেটিবর্ষ বিষয়ের নাম বিভিন্ন লেখতে পাওয়া গেছে।

"সর্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৃণ" এই বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, গোপ্তৃগণ দেশ শাসন করতেন। ভুক্তি শাসন করতেন উপরিক অথবা উপরিক মহারাজাগণ। মাঝে মাঝে রাজপরিবারের ব্যক্তিরা এই পদে নিযুক্ত হতেন। দামোদরপুর লেখতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসকরূপে রাজপুত্র দেবভট্টারকের উল্লেখের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বাসার (বৈশালী) সিল-এর তীরভুক্তি, উপরিক গোবিন্দগুপ্ত রাজপুত্র ছিলেন। মধ্যভারতের তুমাইনের শাসক ঘটোৎকচগুপ্তের পরিচয়ও হয়তো তাই ছিল।

এই উপরিকগণকে অশোকের প্রাদেশিকগণের এবং সাতবাহনদের প্রদেশিক রাজধানীর অমাত্যগণের নামান্তর বলা চলে। গুপ্তযুগে ভুক্তিশাসনে নিযুক্ত যুবরাজের সঙ্গে অশোকের সময়ের কুমার প্রদেশপালদের তুলনা করা চলে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, গুপ্তযুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় পুরোনো আদর্শই নতুন নামে অনুকরণ করা হয়েছিল।

কুমারামাত্য, আয়ুক্ত এবং বিষয়পতিগণ বিষয়গুলি শাসন করতেন। কখনও সামন্ত নৃপতিগণও বিষয় শাসনের ভার পেতেন। এরাণের মহারাজা মাতৃবিষ্ণু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন কোন বিষয়পতি, যেমন অন্তর্বেদীর সর্বনাগ এবং উত্তরবঙ্গের পঞ্চনগরীর কুলবৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীনে ছিলেন। কোটিবর্ষ, ত্রিপুরি এবং ঐরিকিনের বিষয়পতিগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে ছিলেন।

গুপ্তযুগে বিষয় শাসনে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার বিষয়পতিগণ সাধারণত প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হতেন, সম্রাটদের দ্বারা হতেন না। উত্তরবঙ্গের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, কুমারামাত্য, আয়ুক্ত অথবা বিষয়পতিগণ অধিষ্ঠানাধিকরণের (নগর পরিষদের) সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জমি বিক্রয় করতেন। কখনও বা কুমারামাত্যগণ বিষয়াধিকরণের (জেলা আপিসের) সাহায্যে একাজ করতেন। অন্যসময় অষ্টকুলাধিকরণ গ্রামি (গ্রামপ্রধান) এবং গৃহস্থদের (কুটম্বিনগণ) সাহায্য নিতেন। অষ্টগুলাধিকরণ বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, জানা যায় না।

তবে একটি ক্ষেত্রে মহত্তরগণ (গ্রামবৃদ্ধগণ) এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে এর দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত বোঝানো হয়েছে বলা চলে।

প্রতি বিষয়ে একটি বেসরকারি পরিষদ ছিল। কেন্দ্রীয় কর্মচারী, বিষয়পতি, এতে সভাপতিত্ব করতেন। এই পরিষদে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ স্থান ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নগরশ্রেষ্ঠী (গিল্ডের সভাপতি), সার্থবাহ (প্রধান ব্যবসায়ী), প্রথম কুলিক (প্রধান কারিগর) এবং প্রথম কায়স্থ (প্রধান লিপিকার) এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন গিল্ডের সভাপতিগণ পদাধিকারবলে হয়তো পরিষদের সদস্য হতেন। অন্য সদস্যগণ কীভাবে মনোনীত অথবা নির্বাচিত হতেন, জানা যায় না। তবে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের যুক্ত করে গুপ্তগণ যে সাহস এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

বিষয়শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁরা দায়ী থাকতেন। তাঁরা পতিত জমির তত্ত্বাবধান করতেন। পতিত জমি বিক্রয়ের জন্য তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হত। বনবিভাগের কর্মচারীগণও হয়তো তাঁদের অধীনে কাজ করতেন। দণ্ডনায়কগণ (সামরিক বিভাগের কর্মচারী) বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থান করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করতেন। দণ্ডপাসিকগণ এবং চোরোদ্ধরনিকগণ (পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারী) অপরাধীদের ধরে বিচারালয়ে নিয়ে আসতেন। ন্যায়াধিকরণ, ধর্মাধিকরণ এবং ধর্মশাসনাধিকরণের দপ্তরের সিল নালন্দা এবং বৈশালীতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রদেশের এবং জেলার কেন্দ্রে এই বিচারালয়গুলি কাজ করত।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত আলোচনায় বৈশালীতে প্রাপ্ত সিলগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি থেকে প্রাদেশিক এবং নাগরিক শাসনব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এই সিলগুলিতে বিভিন্ন পদ এবং দপ্তরের উল্লেখ আছে। অবশ্য এ সবই উত্তর বিহারের তীরভুক্তি-সম্পর্কিত। যুবরাজ গোবিন্দগুপ্ত এই ভুক্তি শাসন করতেন। এখানকার সিলগুলিতে উপরিক, কুমারামাত্য, মহাপ্রতিহার, তালবর, মহাদণ্ডনায়ক, বিনয়স্থিতিস্থাপক এবং ভডাশ্বপাতপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই পদগুলি ছাড়া যে দপ্তরগুলির নাম বৈশালীর সিলগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি হল যুবরাজ পাদীয় কুমারামাত্য অধিকরণ (যুবরাজের মন্ত্রী বা কুমারামাত্যের দপ্তর), রণভাণ্ডাগারাধিকরণ (যুদ্ধ বিভাগের প্রধান কোষাগারিকের দপ্তর বা কার্যালয়), বলাধিকরণ (যুদ্ধ দপ্তর), দণ্ডপাশাধিকরণ (পুলিশ অধ্যক্ষের দপ্তর), তীরভুক্তি উপরিক অধিকরণ (তীরভুক্তির উপরিকের দপ্তর), তীরভুক্তে বিজয়স্থিতিস্থাপক অধিকরণ (তীরভুক্তির বিনয়স্থিতিস্থাপকের দপ্তর) বৈশালী অধিষ্ঠান অধিকরণ (বৈশালীর নগর সরকারের দপ্তর) এবং শ্রী-পরম ভট্টারক-পাদীয়-কুমারামাত্য-অধিকরণ (সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত কুমারামাত্যের দপ্তর)।

উপরের এই বিবরণের মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত এখানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রদেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আবার প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে তীরভুক্তির কর্মচারীদের বৈশালী অধিষ্ঠানের কর্মচারীদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রণভাণ্ডারগারাধিকরণ, এই দপ্তরটির উল্লেখও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে সামরিক অর্থ-দপ্তরকে আসামরিক অর্থ-দপ্তর থেকে আলাদা করা হত।

গুপ্তযুগে মহকুমার মতো কোন প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা, জানা যায় না। কোন কোন স্থানে বিষয়ের অংশ হিসাবে পথক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এর শাসন কীভাবে পরিচালিত হত, তা অনিশ্চিত। হয়তো পথকের শাসনকাঠামো বিষয়েরই ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল।

সে যুগে সাধারণত বিষয়গুলির পরেই ছিল গ্রাম ও নগর। গ্রামপ্রধান, অন্যান্য কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের, যেমন গ্রামিক, মহত্তর এবং ভোজকদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সাধারণত এই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিষয়ের কর্মচারীদের অধীনে থাকতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ভুক্তির উপরিকগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকত। বাড়িঘর, পথঘাট, বাজার, শ্মশান, মন্দির, কুয়ো, পুকুর, পতিত জমি, বন, কৃষিযোগ্য জমি, সবই গ্রামের শাসকদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমানাকারগণ কর্ষিত এবং অকর্ষিত সব জমিই পরিমাপ করতেন। গ্রামাধ্যক্ষ গ্রাম শাসনের শীর্ষে ছিলেন। একটি বেসরকারি পরিষদ (মহাসভা) তাঁকে সাহায্য করত। মহাসভার সদস্যগণ কীভাবে তাঁদের সদস্যপদ লাভ করতেন, তা বলা যায় না। গ্রামিকগণের ক্ষেত্রে এ যুগে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। পূর্বে গ্রামিকগণ জনপ্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু গুপ্তযুগে তাঁরা সরকারি কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিলেন।

পুরপালের উপর সাধারণত নগরশাসনের ভার থাকত। তাঁকে অনেক সময় কুমারামত্যের মর্যাদা দেওয়া হত। তাঁকে সাহায্য করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নগর পরিষদ ছিল। নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ, নগর পরিষদের সদস্য হতেন। অধিকারিণ পদাধিকারী রাজকীয় কর্মচারী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান করতেন।

এইভাবে গ্রাম, নগর ও বিষয়শাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে গুপ্তসম্রাটগণ সবচেয়ে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় শাসন সরকারি অনুপ্রেরণায় পুষ্ট না হয়ে স্থানীয় স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করুক, গুপ্তসম্রাটগণ তাই চেয়েছিলেন। গুপ্তযুগের নগর পরিষদগুলি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরীর জন্য যে ছয়টি সমিতির বিবরণ দিয়েছেন, তাদের সদস্যগণ ছিলেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গুপ্তযুগে স্থানীয় প্রশাসন কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রের অধীনতা থেকে মুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় নীতি অথবা নির্দেশে বিরোধী না হলে সব সিদ্ধান্তই স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করা হত। জেলা এবং প্রদেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, আয়ুখ্ত ও কুমারামাত্যগণ স্থানীয় প্রশাসন এবং কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মৌর্যযুগের সঙ্গে তুলনায় এক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অশোক জেলাগুলির ক্ষুদ্রতর কর্মচারীদের কার্যকলাপের কথাও ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাইতেন, কিন্তু গুপ্তসম্রাটগণ এ বিষয়ে আয়ুক্ত ও কুমারামাত্যগণের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে সন্তুষ্ট ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ এবং ভুক্তিগুলির সীমানার বাইরে সামন্ত ও গণরাজ্যগুলি ছিল। এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখ এবং অন্যান্য দলিলে এইসব 'প্রত্যন্ত নৃপতি' এবং গণরাজ্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা অধীনতামূলক স্বাধীনতা ভোগ করত বলা চলে। বৃহৎ সামন্ত নৃপতিগণ সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই ভূমিদান-পত্র প্রচার করতে পারতেন। বুন্দেলখণ্ডের পরিব্রাজক-মহারাজাগণ এইভাবে ভূমিদান করেছিলেন। তবে তাঁরা স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচলন করতে পারতেন না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এইসব সামন্ত নৃপতিদের মর্যাদা তাঁদের এবং গুপ্তসম্রাটদের পারস্পরিক শক্তিসামর্থ্যের সমীকরণের উপর নির্ভর করত। প্রবলপ্রতাপশালী সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল এঁরা কর দান করে এবং অন্যান্য উপায়ে সম্রাটের সন্তোষবিধান করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই তা করেননি।

পরিব্রাজক-মহারাজাগণ তাঁদের দলিলে গুপ্তসম্রাট সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। বলা বাহুল্য, এই নীরবতা এক অর্থে বিশেষ বাঙময়।

গুপ্তযুগের শাসন সম্পর্কে কর ও রাজস্বব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগের করব্যবস্থা বিষয়ে বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই, কেননা তৎকালীন লেখগুলি এ সম্পর্কে নীরব। মোটামুটিভাবে গুপ্তযুগে যে করগুলি প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়, সেগুলি হল ঃ (১) ভাগকর অথবা ভূমিকর এর পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ, অথবা এক-চতুর্থাংশ। (২) ভোগকর অথবা চুঙ্গিকর--এই কর গ্রাম এবং শহরের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ হিসাবে বরাদ্দ করা হত। এই দুইটি করই দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। (৩) ভূতপ্রত্যয় বা আবগারি শুল্ক। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শিল্পজাত দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হত। বিষ্টি অথবা বাধ্যতামূলক শ্রম একেবারে অজানা ছিল না। পতিত জমি, বন এবং লবণখনির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল। সেগুলিকে ভাড়া দিয়ে অথবা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করা হত।

রাজস্বমন্ত্রী কর এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। এগুলি বেশিরভাগই দ্রব্যের মাধ্যমে এবং অংশত, অর্থের মাধ্যমে, আদায় করা হত। পতিত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হলেও, তার পরিচালনার ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর থাকত।

গুপ্তযুগের ভূমিরাজস্বের সঙ্গে জমির মালিকানার প্রশ্নটি জড়িত। ডঃ বসাক মনে করেন যে, তখন জমির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল না। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি প্রধানত দুইটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমত তিনি বলেন যে, প্রদেশের এবং জেলার জনপ্রতিনিধি, মহামাত্র এবং অন্য ব্যবসায়িকগণ, এমনকি সাধারণ মানুষের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্র জমি হস্তান্তরিত করতে পারত না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন যে, ফরিদপুরে প্রাপ্ত একটি দানপত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে আইনগত, জমির বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-ষষ্ঠাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাবে। বাকি অর্থ কোথায় যাবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ এই দানপত্রে না থাকলেও ডঃ বসাকের কাছে এটা খুব স্পষ্ট মনে হয়েছে যে, অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ যেত গ্রামসভার কোষাগারে।

ডঃ ঘোষাল, ডঃ বসাকের দুটি যুক্তিই খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, ডঃ বসাকের মতো যথেষ্ট তথ্য- নির্ভর নয়। তিনি বলেন, গুপ্তযুগের লেখতে এই প্রসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের কোন উল্লেখ নেই, ক্ষুদ্র কর্মচারীদের উল্লেখ আছে এবং জমি বিক্রয়ের জন্য তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন হত, এমন কোন প্রমাণ নেই। তিনি আরও বলেছেন ডঃ বসাকের দ্বিতীয় যুক্তিটি 'ধর্মষড়ভাগ' শব্দের ভুল অনুবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ, ধর্মীয় পুণ্যের ভাগ। তখনকার দিনে জমি কেনার জন্য আবেদনপত্রে প্রার্থীকে লিখিতভাবে জানাতে হত যে, পরে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে ক্রেতা পুনরায় সেই জমি হস্তান্তর করবেন। সুতরাং মনে করা হত যে, রাজা প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করে সেই সম্ভাব্য পুণ্যের ভগ্নাংশ লাভ করবেন।

উপরোক্ত আলোচনায় জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগে দীর্ঘকাল কৃষকই জমির মালিক ছিল বলে মনে হয়। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত লেখগুলিতে এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। মনে হয় রাষ্ট্র এবং গ্রামসম্প্রদায় যৌথভাবে জমির মালিকানা ভোগ করত। জমি হস্তান্তরের অধিকার ছিল যুগ্মভাবে রাজা এবং জেলা পরিষদগুলির হাতে। সমগ্র সাম্রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্থির এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও সম্ভব নয়। তবে রাজকীয় শস্যাগারগুলিতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য যে প্রচুর পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করা হত, তা থেকে জমিতে রাজার কোন অধিকার ছিল না, তা মনে হয় না।

হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসারে রাজা রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে তিনি স্বয়ং বিচার করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি রাজধানীর বিচারালয়ে নির্ণায়ক সভ্যদের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। এই সর্বোচ্চ আদালতে গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার বিচার করা হত। নিম্ন-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এখানে আপীল করা যেত। জেলা এবং প্রাদেশিক শহরগুলিতে সরকারি আদালত ভিন্ন জনসাধারণের বিচারালয় ছিল। গিল্ডগুলি বিচার করত। এছাড়া শহরে ও গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। গুপ্তযুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে বিচারকার্য সমাধা করা হত বলে সরকারি আদালতগুলিতে মোকদ্দমা স্তূপীকৃত হতে পারত না। বৃহস্পতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বিশদ ও ব্যাপক বিচারপদ্ধতির কথা জানা যায়। নালন্দা এবং বৈশালীতে প্রাপ্ত সিল থেকে জানা যায় যে, প্রতি আদালতের নিজস্ব সিল ছিল। ফা-হিয়েন গুপ্তযুগের ফৌজদারি আইনের কোমলতার কথা বলেছেন। বেশিরভাগ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা। তিনি বলেছেন যে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। সেখানে অঙ্গচ্ছেদ, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়।

পুলিশ বিভাগের শীর্ষে নিশ্চয়ই কেউ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদের সরকারি আখ্যা কি ছিল, তা জানা যায় না। বৈশালীর সিল-এ দণ্ডপাশিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হয়তো জেলা পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন। পুলিশ বাহিনীর সাধারণ কর্মীদের চাট এবং ভাট বলা হত।

বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ হয়তো কোন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর অধীনে ছিল। দ্রঙ্গিকগণ (চুঙ্গি কর্মচারী) তাঁর অধীনে কাজ করতেন।

রাজা নাবালক না হলে সামরিক বাহিনীর শীর্ষে থাকতেন। তাঁর অধীনে মহাসেনাপতিগণ এবং তাঁর অধীনে হয়তো মহাদণ্ডনায়কগণ ছিলেন। চতুরঙ্গ সেনা বলতে যা বোঝায়, তা এ যুগে ছিল না। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হস্তিবাহিনী নিয়ে সৈন্যদল গঠিত হত। সে যুগে কোন রথবাহিনী ছিল না। হয়তো তার পরিবর্তে উষ্ট্রবাহিনী ছিল। প্রতি বিভাগের কর্মীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাদের অশ্বপতি, মহাঅশ্বপতি, পীলুপতি, মহাপীলুপতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হত প্রতিটি গ্রাম এবং নগর পরিখা অথবা প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করা হত। সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে ভেদরেখা খুব স্পষ্ট ছিল না। মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য ছিল। কৃতী সামরিক কর্মচারীগণ মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হতেন। আবার একজন মন্ত্রিণ (গোপন উপদেষ্টা) মহাদণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত হতে পারতেন।

গুপ্তযুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাস্তা, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করা হত। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সত্র, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দানের উল্লেখও সেখানে বারংবার পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ যাতে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি মেনে চলে, তা দেখার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। অনেকে মনে করেন যে, বিনয়স্থিতিস্থাপক বলতে এই কর্মচারীদের বোঝাত। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের কর্মচারীদের বলা হত অগ্রহারিক। গিরনার লেখতে উল্লিখিত হ্রদ জনকল্যাণমূলক কাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ফা-হিয়েন লিখেছেন যে, রাজার দেহরক্ষী এবং পরিচালকগণ নিয়মিত বেতন পেতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তসম্রাটগণ তাঁদের সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দিতেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে মৌর্যদের নীতি অনুসরণ

করেছিলেন। কিন্তু সর্বত্র এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। অন্যান্য কর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জমি পেতেন। এ যুগের অসংখ্য দানপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে ভূম্যধিকারী শ্রেণী সৃষ্ট হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ফা-হিয়েন সাধারণভাবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষকে তাদের বাড়িঘরের বিবরণ সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত করতে হত না। তাছাড়া তাদের সর্বত্র যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌর্যযুগের কঠোর গুপ্তচরব্যবস্থা এ যুগে অনেকাংশে শিথিল হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের চিরকালীন গুপ্তচরব্যবস্থা এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের কথা মনে রাখলে, গুপ্তদের শাসন যে প্রাচীন ভারতের ফৌজদারি দণ্ডবিধি ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, তা স্বীকার না করে পারা যায় না। নালন্দায় গুপ্তসম্রাটগণ অনেকেই একাধিক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এ থেকে জ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গুপ্ত শাসনের ফলাফল কী হয়েছিল, তার ইঙ্গিত ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, মধ্যপ্রদেশের মানুষ তখন 'অসংখ্য এবং সুখী' ছিল। ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, গুপ্তসম্রাটগণ, গরিবদের প্রতি তাঁদের উদারতা এবং সাধারণভাবে আর্থিক এবং নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য সঙ্গতভাবেই গর্ববোধ করতেন।

উপরে গুপ্তশাসনের যে বর্ণনা দেওয়া হল, তা এইযুগের 'স্বর্ণ যুগ' আখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অধুনা গুপ্ত শাসনের মূল্যায়ন সম্পর্কে ভিন্ন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে যে, এ যুগের অর্থনীতিতে দুইটি যুগপৎ এবং পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এর একদিকে ছিল সমৃদ্ধি এবং মুষ্টিমেয় নগরে-বন্দরে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে ছিল অনেক বড় শহরের অবক্ষয়। ফা-হিয়েন লিখেছেন যে, শ্রাবস্তীতে মাত্র ২০০টি পরিবার বাস করত। একদা কোলিয়গণের রাজধানী রামনগর পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। কপিলাবস্তু, কুশিনার, প্রাচীন রাজগৃহ এবং গয়া তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন বাণিজ্যপথের আর কোন গুরুত্ব ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ধীরে ধীরে গ্রামগুলিই প্রাধান্য অর্জন করেছিল। পাটলিপুত্র তখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের বৃহত্তম নগরী ছিল, কিন্তু সেখানে অশোকের প্রাসাদ জীর্ণ, পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মনে হয় এই প্রাসাদের ছায়া দ্রুত সমগ্র নগরীকে আচ্ছন্ন করেছিল। কেননা হিউয়েন সাঙ, যিনি অনতিকাল পরে এদেশে এসেছিলেন, এই নগরীর চরম দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ যুগে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজদরবার নতুন বিলাসিতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের নিদর্শন, বিশেষত অজন্তা (পরে আলোচ্য) এই যুগের। তবে এখানেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একদা অনেকের মিলিত প্রয়াসে সাঁচি এবং কার্লেতে যে শিল্প সৃষ্ট হয়েছিল, এ যুগে তা আর সম্ভব ছিল না। এ যুগে শিল্পসৃষ্টির পিছনে বিশেষভাবে রাজসভা, অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। উপর থেকে 'সামন্ততন্ত্রের' প্রাথমিক সাফল্যের ফলে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে আগের তুলনায় অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারী ছিল। গুপ্তযুগের যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, তা পূর্বের অথবা পরের, কোন যুগে, পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে এই যুগ একক মহিমায় মণ্ডিত বলা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ যুগে বিলাস দ্রব্যের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের বাহন, রৌপ্যমুদ্রা, দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। বর্ধিত জনসংখ্যা এবং

নিত্যনতুন গ্রামবসতির দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে ব্যাপক হারে মুদ্রা প্রচলনের আবশ্যকতা ছিল, এযুগে তার বিশেষ অভাব দেখা গিয়েছিল। ফা-হিয়েন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ির উল্লেখ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে ছিলেন, কিন্তু বিনিময়ের অন্য মাধ্যম তাঁর চোখে পড়েনি। ইতিহাসের অন্য উপাদান থেকে আমরা সুবর্ণ, দিনার, রূপক ইত্যাদি বিভিন্ন মুদ্রার কথা জানতে পারি। তাই মনে হয় যে, এগুলির ব্যবহার ব্যাপক ছিল না। গুপ্তযুগে অনেক কর্মচারীকে অর্থের মাধ্যমে বেতন না দিয়ে জমির মাধ্যমে দেওয়া হত। অবশ্য এই জমি তখনও পর্যন্ত, পূর্ণ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যেমন দেওয়া হয়, বংশানুক্রমিকভাবে দান করা হত না। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হত। পূর্ণ-সামন্ততন্ত্রে, দরিদ্র শ্রেণী যেমন করের পরিবর্তে শ্রম দান করে, এ যুগে তা করা হত না। গুপ্তযুগের সমাজে অর্থনীতিতে পূর্ণ-সামন্ততন্ত্র ছিল না, কিন্তু তার বীজ নিহিত ছিল। গুপ্তযুগের এই সমৃদ্ধি শ্রেণীগত এবং স্থানগত দুদিক থেকেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগের উন্নতিকে তাই সর্বাঙ্গীণ বলা যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত শাসনব্যবস্থা একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। গঠনতন্ত্রের দিক থেকে এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়সাধন করা হয়েছিল। শাসনকার্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। জেলা, গ্রাম এবং নগরের শাসনব্যবস্থা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব সর্বদা রাজার হাতে ছিল তাই এ ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও, দক্ষ ছিল। এ যুগের রাজারা জনকল্যাণের এবং কর্তব্যপালনের উচ্চ-আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। মৌর্যযুগের তুলনায় এ যুগের শাসকের শোষক-ভূমিকা অনেক কম ছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই শাসনপদ্ধতি বিশেষ মূল্যবান। কেননা ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

৪খ.৫ দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন-পরবর্তী অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বকাটকগণ। উত্তর ভারতে শুঙ্গ এবং কণ্বদের মতো বকাটক বংশেও ছিলেন ব্রাহ্মণ। ডঃ কে. পি. জয়সোয়ালের মতে বকাটকগণের আদি নিবাস ছিল বুন্দেলখন্ডের ওরছা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাগাত জেলায়। অপরদিকে অধ্যাপক নিরাশির মতে বকাটকরা ছিলেন মূলত দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নাগপুর ও বেরারের অন্তর্গত আকোলাই ছিল বকাটকদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল।

বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি তৃতীয় শতকের তৃতীয় পাদে তাঁর রাজত্বকাল শুরু করেন। অজন্তায় প্রাপ্ত একটি লিপি ও পুরাণ-বিধৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিন্ধ্যশক্তি বিদিশা (ভোপালের নিকটবর্তী আধুনিক ভিলসা) এবং পুরিকা (আধুনিক বেরার) শাসন করতেন। পুরিকা ছিল তাঁর রাজধানী। বিন্ধ্যশক্তি কোন আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা ধারণ করেননি। তাই অনুমান করা যায় যে, বকাটকবংশের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল পরবর্তী শাসক প্রথম প্রবরসেনের রাজত্বকালেই।

প্রথম প্রবরসেন 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর রাজত্বকালে একটি রাজপেয় ও চারটি অশ্বমেধ

যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা হয়তো তাঁর রাজ্যজয়ের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র বকাটক শক্তি উত্তর মহারাষ্ট্র, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করায়ত্ত করে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রবরসেন তাঁর পুত্র গৌতমীপুত্রের সঙ্গে ভরাশিব নাগবংশীয় রাজা ভাবনাগের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহবন্ধন বকাটকদের মধ্যভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের সহায়ক হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

প্রথম প্রবরসেনের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র গৌতমীপুত্রের জীবনাবসান হয়েছিল তাঁর পিতার রাজত্বকালেই। প্রবরসেনের দ্বিতীয় পুত্র সর্বসেন বৎসগুল্ম নামক এক নূতন শাখার প্রবর্তন করেছিলেন আকোলা জেলায়। প্রথম প্রবরসেনের অপর দুই পুত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় যে, তাঁরা দক্ষিণ কোশল ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের উপর তাঁদের অধিকার বজায় রেখেছিলেন।

বকাটক বংশীয় রাজাগণের লেখগুলির থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রবরসেনের পর বকাটক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র রুদ্রসেন। সমসাময়িক যুগের বকাটক লিপিগুলি থেকে আরো জানা যায় যে, পদ্মাবতীর নাগবংশীয় রাজাগণ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই লিপিগুলিতে ভারসিব নাগবংশীয় রাজা ভাবনাগের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর মাতামহের সহায়তা লাভ করেছিলেন, এবং বকাটক সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের যে বিবরণ হরিষেণ প্রশস্তিতে পাওয়া যায় তা থেকে অনেকে মনে করেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের বারোজন বিজিত রাজার মধ্যে হয়তো রুদ্রসেনও ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এই প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নয়জন রাজার মধ্যে বর্ণিত রুদ্রসেন ছিলেন বকাটকবংশীয় নৃপতি রুদ্রসেনের সঙ্গে অভিন্ন। ডঃ পি. এল. গুপ্ত এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণ প্রশস্তিতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত দক্ষিণ ভারতীয় বারোজন রাজার নামের তালিকায় রুদ্রসেনের নাম অনুপস্থিত সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত যদি বকাটক নৃপতি প্রথম রুদ্রসেনকে সত্যিই পরাজিত করতেন, তাহলে, এই প্রশস্তিতে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা থাকত, কারণ বকাটক সাম্রাজ্য তখন আয়তনে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দক্ষিণে বকাটকদের প্রাধান্য ছিল মূলত মধ্য ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁর সমর অভিযান পরিচালিত করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের পূর্বদিকে। তাই বকাটকগণের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর কোন শক্তিপরীক্ষা ঘটেনি। ডঃ পি. এল. গুপ্তর মতে বকাটকদের দক্ষিণ ভারতের প্রতিপত্তির কথা স্মরণে রেখে সমুদ্রগুপ্ত হয়তো তাদের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত ও বকাটকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা হয়তো এই চুক্তিরই ক্রমপরিণতি।

অন্যদিকে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী সমুদ্রগুপ্তর এরাণ লেখের উল্লেখ করে বলেছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত বকাটকদের মধ্যভারতে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর মতে মধ্যভারতের ঐ অঞ্চল তখন বকাটকদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল ছিল না, তাঁরা তাঁদের সামন্ত নৃপতিদের মাধ্যমে আলোচ্য অঞ্চলটিকে শাসন করতেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে তাই এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, প্রথম রুদ্রসেনের পুত্র পৃথিবীসেনের রাজত্বকালে তাঁরই এক সামন্ত নৃপতি ব্যাঘ্রকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন।

প্রথম রুদ্রসেন-পরবর্তী বকাটক রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র প্রথম পৃথিবীসেন। পিতার মতো তিনিও ছিলেন শৈব এবং তাঁর শাসনকালে বকাটক সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। ডঃ পি. এল. গুপ্তর মতে বিচক্ষণ

পৃথিবীসেন প্রবল পরাক্রমী গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে কোন বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি না করে তাঁর সাম্রাজ্যের সংহতি অটুট রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন শকক্ষত্রপ-অধ্যুষিত মালবে ও কাথিয়াবাড় জয় করতে প্রয়াসী হন, তখন তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সহায়তা করেছিলেন। এই বন্ধুত্বের পরিণতি হিসাবেই বকাটকবংশীয় যুবরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর কন্যা প্রভাবতীগুপ্তর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। নাগপুরের নিকটবর্তী নন্দীবর্ধনে তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

পরবর্তী বকাটক বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালে গুপ্ত - বকাটক মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। অধ্যাপক স্মিথ বলেছিলেন যে, বকাটক রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান গুপ্তদের শকরাজ্যগুলি আক্রমণের সহায়ক হয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে এই মৈত্রীকে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ কূটনৈতিক সাফল্য হিসাবে দেখা যায়। অনেকে বলেছেন যে, আর্থিক দিক থেকে বকাটক রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ। বকাটক সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ ভারতে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। তাই এই মৈত্রীর ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জামাতা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। প্রভাবতী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি যুগপৎ প্রথম রুদ্রসেন এবং তাঁর স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের অকালমৃত্যুর পর বকাটক শাসনভার তিনি স্বহস্তে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে বকাটক রাজ্যে গুপ্তদের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যাকে রাজ্য পরিচালনায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় রুদ্রসেনের দুই পুত্র দিবাকরসেন ও দ্বিতীয় প্রবরসেন পর্যায়ক্রমে বকাটক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে দিবাকরসেনেরও অকালমৃত্যু হয়। তাই তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় প্রবরসেন পরবর্তী বকাটক রাজা রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন তাম্র অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বিদর্ভ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যথা আমরোতি, ওয়ার্দা, বেতুল, নাগপুর, ছিনদ্বারা, ভানদ্বারা এবং বালাঘাট তখন বকাটক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বেরার ছিল তাঁর শাসনাধীন। দ্বিতীয় প্রবরসেন তাঁর নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ার্দা জেলার পাবনার অন্তর্ভুক্ত প্রবরপুরে। দ্বিতীয় প্রবরসেন শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা বা শাসকই ছিলেন না, ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-অনুরাগীও। প্রাকৃত ভাষায় রচিত *সেতুবন্ধ* কাব্যটির রচয়িতা তিনিই ছিলেন বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে শৈবধর্মে বিশ্বাসী হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির প্রতি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রবরসেনের পর ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রসেন পরবর্তী বকাটকসম্রাট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কদম্ববংশীয় রাজা কাকুস্থবর্মণের কন্যা অজিতা-ভট্রিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। সমকালীন সরকারি নথিপত্র অনুসারে কোশলের রাজগণ এবং মেকলা ও মালবের নৃপতিগণ তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করেছিলেন যেহেতু এ অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন নরেন্দ্রসেন। তবে নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালের শেষ দিকে নলবংশীয় রাজা ভবদত্তবর্মণ তৎকালীন রাজধানী নন্দীবর্মন আক্রমণ করেছিলেন। নরেন্দ্রসেন এই আক্রমণ প্রতিহত করে নলবংশীয় রাজাদের অধিকৃত ছত্রিশগড় অঞ্চলটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবত বকাটক বংশের অপর এক শাখার নৃপতি হরিষেণ ও নলবংশীয় রাজা ভবদত্তবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। দক্ষিণ গুজরাটের ত্রৈকটক বংশীয় রাজা দাহরাসেনের

সঙ্গেও তার যুদ্ধ হয়েছিল। বকাটক বংশের প্রধান শাখার তিনিই ছিলেন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তাঁর মৃত্যুর পর বকাটক বংশের অপর এক শাখা বৎসগুল্মর নৃপতি হরিষেণ বিদর্ভ জয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুইশতবর্ষব্যাপী বকাটক রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

অধ্যাপক ভি. ভি. মিরাশীর মতে বকাটকবংশীয় রাজগণ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা শাসন-পরিচালনাতেই কৃতিত্ব অর্জন করেননি, সাহিত্য ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপেও উত্তর ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমতুল্য হয়ে উঠেছিলেন।

৪খ.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১) গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তর আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য বিজয়নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলা যায় কী?

৩) গুপ্ত সাম্রাজের পতনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

৪) গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

৫) দক্ষিণ ভারতের বকাট সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্তদের সম্পর্ক বিবৃত করুন।

৪খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। পি. এল. গুপ্ত ঃ *দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্, প্রথম খণ্ড (১৯৭৪)*

২। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) দি ক্লাসিকাল এজ্ (১৯৭০)

৩। আর. সি. শর্মা ঃ *পার্সপেকটিভস্ অফ্ সোস্যাল এ্যান্ড ইকনমিক্ হিস্ট্রি অফ্ আর্লি ইন্ডিয়া (১৮৮৩)*

৪। অশ্বিনী আগরওয়াল ঃ *রাইজ এ্যান্ড ফল্ অফ্ দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্ (১৯৮৯)*

৫। এন. কে শাস্ত্রী ঃ *এ হিস্ট্রি অফ্ সাউথ ইন্ডিয়া (১৯৬৬)*

৬। ভি. আর. আর. দিকশিতার ঃ *দি গুপ্তা পলিটি (১৯৫২)*

৭। আর. এন. সালেটর ঃ *লাইফ্ ইন্ গুপ্তা এজ্ (১৯৪৩)*

৮। এস. কে. মাইতি ঃ *দি ইকনমিক্ লাইফ্ অফ্ নর্দান ইন্ডিয়া, ৩০০-৪০০ খ্রিস্টাব্দ (১৯৫৭)*

৯। আর. এন. ডাণ্ডেকার ঃ *দি এজ্ অফ্ দি গুপ্তাস এ্যান্ড আদার এসেস্ (১৯৮২)*

১০। রবীন্দ্র শর্মা ঃ *কিংগশীপ ইন ইন্ডিয়া ফ্রম্ দি ভেদিক এজ্ টু দি গুপ্তা এজ (১৯৯৫)*

১১। এ. এস. আলতেকর ঃ *দি কয়েনজ্ অফ্ দি গুপ্তা এম্পায়ার (১৯৫৭)*

১২। এ. এস. আলতেকার ও আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) ঃ *দি বকাটকা গুপ্তা এজ্ (১৯৪৬)*

১৩। এস. আর. গোয়েল ঃ *এ হিস্ট্রী অফ্ দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্ (১৯৬৭)*

১৪। ডি. কে. গাঙ্গুলী ঃ এসপেকট্স্ অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ (১৯৭৯)।